দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

দিদির দূতেরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের মেশিনারি— পৃঃ ২৬

মোদী সরকারের গতিশীল আর্থিক উন্নয়নের বাজেট ('২৩-'২৪) — পৃঃ ১১

৭৫ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।। ২৯ মাঘ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

দিশাহারা দিদির দূত

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২৯ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৩ ফেব্রুয়ারি - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

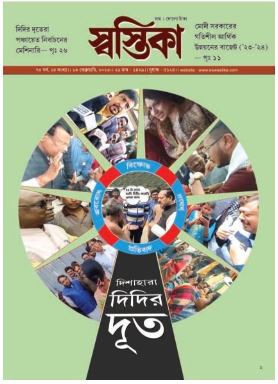

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

দুয়ে দুয়ে পাঁচ হয় না, তাই চোদ্দবছর পরেও মমতার রাজনৈতিক বোধ গড়ে উঠল না ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

টাকা কি মোদীর নাকি? ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

দেশের সমবায় সংস্থাগুলি প্রথম উপযুক্ত পরিচিতি পেল ◻ অমিত শাহ ◻ ৮

মোদী সরকারের গতিশীল আর্থিক উন্নয়নের বাজেট ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১১

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সবচেয়ে বড়ো উপহার মোদীনোমিক্স ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৩

বিবিসির প্ররোচনায় মোদী বিরোধীরা উল্লসিত ◻ রবীন্দ্রনাথ দত্ত ◻ ১৬

গ্রামের মানুষ ওঝা হয়ে দিদির ভূত তাড়াতে ব্যস্ত ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ১৭

দূতের হেনস্থায় ঝাপসা হচ্ছে বাঙ্গলার মেয়ের মুখ ◻ ভবানী শঙ্কর বাগচী ◻ ২৩

দিদির দূতেরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের মেশিনারি ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৬

সত্যই পথ, সেবাই ধর্ম ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

পরাধীন ভারতে নারীশিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ সাবিত্রীবাঈ ফুলে ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৪

রোমিলা থাপারের কলোনিয়াল হ্যাংওভার এখনও কাটেনি ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৩৫

সিগিরিয়ার রাবণের দুর্গের সত্যি-মিথ্যে ◻ সন্দীপ চক্রবর্তী ◻ ৩৬

আলিগড়ে ইসলামি জেহাদি স্লোগান ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৪৩

ইকবাল দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেছিলেন ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ খেলা : ৩৮ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২০ ফেব্রুয়ারি
২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২০ ফেব্রুয়ারি
২০২৩

এবারের গঙ্গাসাগর

কেমন হলো এবারের গঙ্গাসাগর মেলা? অনেকেই বলেছেন এবারের গঙ্গাসাগর মেলা হয়ে উঠেছিল রাজনীতির আখড়া। চারিদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল বিশাল কাটআউট অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু লেগেছে। যারা ঝালে-ঝোলে-অম্বলে রাজনীতি মেশান না তাদের অভিযোগ, একটি তীর্থস্থানকে এভাবে রাজনীতির মঞ্চ না বানানোই ভালো করতেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে গঙ্গাসাগর নিয়ে সবিস্তার আলোচনা।

লিখবেন— হীরক কর, বিশ্বপ্রিয় দাস প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মানুষ ক্ষোভে ফুঁসিতেছে

সত্যিই ইহা চোরেদের সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সিপিএমের অত্যাচারী শাসনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বড়ো আশা করিয়া সরকার পরিবর্তন করিয়া বর্তমান শাসকদলকে ক্ষমতায় বসাইয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি বৎসর অতিক্রান্ত হইতেই পরিষ্কার হইয়াছে যে ইহারা বামেদের চাইতেও ভয়ংকর। ভীতি প্রদর্শন, হিংসা ও সন্ত্রাসের দ্বারা বিরোধীকণ্ঠ রোধ করিয়া এই রাজ্যে তাহারা একছত্র অধিপতি হইয়া মানুষের সেবার নামে অবাধে চুরি করিয়াছে। চুরি ও দুর্নীতিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের চুনোপুঁটি নেতা হইতে শুরু করিয়া বড়ো বড়ো নেতা, এমনকী মন্ত্রীও মানুষের সবকিছু লুঠ করিয়া রাশি রাশি টাকা ও সম্পদ সঞ্চিত করিয়াছে। গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকার কাটমানি খাইয়া তাহারা রাতারাতি ধনী হইয়া উঠিয়াছে। সর্বক্ষেত্রে তাহারা কাটমানি খাইয়াছে। ইহার জন্য তাহাদের চক্ষুলজ্জার বালাই পর্যন্ত ছিল না। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এবং উচ্চ আদালতের বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্ত হইবার পর তাহাদের নেতা-মন্ত্রীদের শ্রীঘরে স্থান হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের আচার আচরণে বিন্দুমাত্র লজ্জার অনুভূতি প্রকাশ পাইতেছে না। সর্বত্র তাহাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠিয়াছে। সমগ্র দেশ দেখিতেছে, পশ্চিমবঙ্গে চোরেদের রাজত্ব চলিতেছে।

ইহার মধ্যেই পঞ্চায়েত ভোট আসিবার সময় হইয়াছে। পঞ্চায়েতগুলিই হইল তাহাদের এক-একটি তহবিল। এই তহবিল যেন হাতছাড়া না হয় তাহার জন্য তাহারা সুরক্ষা কবচ তৈরি করিয়াছে। নাম দিয়াছে দিদির সুরক্ষা কবচ। অর্থাৎ রাজ্যবাসীর জন্য দিদি কী কী সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফিরিস্তি শুনাইয়া মন ঘুরাইবার আয়োজন। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহা তাহাদের জনসমর্থন যাচাই করিবার কৌশলের সহিত ভোটারদের ভীতি প্রদর্শনের জন্যও বটে। কিন্তু রাজনৈতিক মহল মনে করিতেছেন, ইহা আসলে দিদি এবং তাঁহার দলের নেতা-মন্ত্রীদের বাঁচিবার নিমিত্ত সুরক্ষা কবচ। ইহার জন্য দিদি নাকি কয়েক লক্ষ নেতা-কর্মী এবং কয়েক শত রাজ্য নেতাকে নিয়োগ করিয়াছেন। ১৮ জানুয়ারি হইতে তাহারা শুরু করিয়াছেন তাহাদের কর্মসূচি। রাজ্যের মানুষ কী পরিমাণে ক্ষুব্ধ রহিয়াছেন এই কয়দিনেই তাহারা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছেন। সর্বত্রই তাহাদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে পড়িতে হইতেছে। পাহাড় হইতে সাগর সর্বত্র ক্ষোভে ফুঁসিতেছে মানুষ। পানীয়জল, রাস্তা, আবাস, সিন্ডিকেটরাজ, কাটমানি, চাকুরিচুরি, গোরুপাচার প্রভৃতি লইয়া মানুষ তাহাদের ক্ষোভ উগরাইয়া দিতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, সাংসদকে খাবারের থালা ফেলিয়া পলাইতে হইতেছে। কোথাও বিধায়ককে গাড়ি হইতে নামিতে দেওয়া হইতেছে না। কোথাও গ্রামে প্রবেশের রাস্তায় 'দিদির দূতের প্রবেশ নিষেধ' লিখিয়া পোস্টার ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। দলীয় সমর্থকরাও তাহাদের নেতাদের কীর্তিকলাপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উদ্‌গীরণ করিতে ছাড়িতেছে না। সর্বত্র একই চিত্র। রাজ্যের মানুষ প্রচণ্ড ক্ষোভে ফুঁসিতেছে।

আসল কথা হইল, দিদি বড়ো বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার নেতা-মন্ত্রীরা যে বিপুল পরিমাণে পুকুর চুরি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রাজ্যপাট ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে। মানুষ বিপদে পড়িলে যেইরূপ কবচ ধারণ করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ কবচ ধারণ করিয়াছেন। মোটেই ইহা রাজ্যবাসীর সুরক্ষা কবচ নহে, ইহা স্বয়ং তাঁহার গদি এবং তাঁহার দলের নেতা-মন্ত্রীর সুরক্ষার জন্য। পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন, তাই ওই তহবিলগুলি সুরক্ষিত রাখিবার আয়োজন ব্যতীত কিছু নহে। রাজ্যের গ্রামগঞ্জের মানুষের সুরক্ষা প্রদানের বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা তাঁহার নাই। কর্মসূচিতে যাইয়া স্বীয় দলেরই প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে তাঁহার দূতের প্রকাশ্যে থাপ্পড় মারিবার ঘটনায় ইহা প্রমাণ করিয়াছে। অশান্তি এড়াইবার জন্য কোথাও কোথাও পুলিশই নাকি তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছে। সমগ্র রাজ্যে সর্বত্র একই চিত্র। কুকর্মের ফল শাসকদলকে ভোগ করিতেই হইবে। মানুষ যত শীঘ্র তাহাদের বিদায় ত্বরান্বিত করিবে, পশ্চিমবঙ্গেরও তত শীঘ্রই রাহুমুক্ত ঘটিবে।

সুভাষিতম্

ন মুক্তাভির্ন মাণিকৈঃ ন বস্ত্রৈর্ন পরিচ্ছদৈঃ।

অলংকিয়েৎ শীলেন কেবলেন হি মানবঃ।।

মুক্তা, মণি, বস্ত্র অথবা পোশাকপরিচ্ছদে নয়, সৎ চরিত্রের দ্বারাই মানুষ বিভূষিত হয়ে থাকে।

দু'য়ে-দু'য়ে পাঁচ হয় না

তাই চোদ্দবছর পরেও মমতার রাজনৈতিক বোধ গড়ে উঠল না

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দু' হাজার আটের সেপ্টেম্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বাস্তববোধহীন রাস্তার রাজনীতিক' বলে ইঙ্গিত করে চিঠি লিখেছিলেন অমর্ত্য সেন। বলেছিলেন মমতার শিল্প বিরোধী আন্দোলনের ফলে রাজ্যের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ২০১১ থেকে রাজ্যবাসী তা হাড়ে হাড়ে মালুম পাচ্ছে। সে চিঠি যে সম্পাদক ছেপেছিলেন মমতা জমানায় তাকে সরে যেতে হয়।

নবতিপর অমর্ত্যবাবু এখন একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে মমতা বন্দনায় মেতে উঠেছেন। যদিও আমার মনে হয় না মমতার অতীত আর বর্তমানের সব দোষকে মুছে দিয়ে সেন তাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য বলেও মনে করেছেন। সবাই জানেন অমর্ত্যবাবু 'যখন যেমন তখন তেমন' ধাতের মানুষ।

আর এটা তার সব থেকে বড়ো ঠাট্টা। সকলে বুঝলেও মমতা বোঝেন না। আর তাতেই অমর্ত্যবাবুদের মতো মানুষদের সুবিধা। আপাতত সেন বিজেপি আর হিন্দুত্ব বিরোধী। অথচ ১৯৯৯ সালে বিজেপি জমানাতে তিনি 'ভারতরত্ন' নিতে পিছপা হননি। ১৯৯৮ তাঁর নোবেল স্মৃতি পুরস্কারকে ভারতের প্রথম বিজেপি প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এই মুহূর্তে নিজের ব্যাপারে কিছু একটা বেগতিক ঘটতে চলেছে এটা বুঝতে পেরে অমর্ত্যবাবু মমতা নৌকাতে উঠেছেন। খানিকটা হাস্যকরভাবে মমতা তাঁর জন্য হঠাৎ বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। নবতিপর সেনের জন্য হঠাৎ কেন এই ব্যবস্থা হলো তা বোঝা যায়নি।

মমতার রাজনৈতিক বোধের বড়ো অভাব। খানিকটা অযাচিতভাবেই তিনি সেনের শান্তিনিকেতনের বাড়ির 'জমি-জটে' মাথা গলিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর কোনোভাবেই করা উচিত ছিল না। অমর্ত্যবাবুর মতো এ রাজ্যের অনেক ব্যক্তিরই জমির সমস্যা রয়েছে। অথচ রাজধর্ম থেকে সরে এসে মমতা এই অন্যায়টা করলেন। বোঝাই যাচ্ছে মমতা তাঁর পুরোনো 'কংগ্রেস কালচার'-কে ভুলতে পারেননি। তাই দল, রাজ্য বা দেশ নয়, ব্যক্তি আর পরিবারই প্রথম।

সবাই জানেন সেন আপাতত তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়ির 'জমি-জটে' ফেঁসে রয়েছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জমি দখলকারী' ইঙ্গিত করে নোটিশ পাঠিয়েছেন। অমর্ত্যবাবু আর তাঁর সমর্থকদের বোঝা দরকার যে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেই কারো সাত খুন মাফ হয়ে যায় না। কেবল পুরস্কারকে সামনে রেখে আইনের চোখ বাঁধা যায় না। আর শুধু চক্রান্তের তত্ত্ব আউড়ে শাক দিয়ে জমি কেলেঙ্কারি ঢাকা যায় না যে চেষ্টাটা এখন চলছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন জেদ করে কিছুতেই নিজের দোষ মানতে রাজি থাকেন না, অমর্ত্যবাবুও সে পথের পথিক বলে আমার মনে হয়েছে। তাই দু'য়ে-দু'য়ে চার না হয়ে পাঁচ ঘটছে।

জমি ঘিরে তাঁর অপরাধের সবটুকু জেনেও সেন জোর করে চোখ বুজে রয়েছেন আর মমতার মতো বোধহীন নেতাকে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। মমতাকে দাবার বোড়ে সাজিয়ে জমি বৈতরিণী পার হতে চাইছেন। মমতা সেটা বুঝলেও তা থেকে সরে না আসাটাই তাঁর সব থেকে বড়ো রাজনৈতিক বোধের অভাব।

জেলে আটক অনুব্রত মণ্ডলকে ঘিরে বীরভূমে মমতা এখন বেকায়দায় রয়েছেন। তাই সুযোগ বুঝে তাঁর নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করতে তিনি অমর্ত্যবাবুকে সামনে ধরছেন বলে অনেকের ধারণা। আর তাই যদি হয় তাহলে রাজ্যের জনমানসে দু'জনের ভাবমূর্তি মাটিতে মিশিয়ে যেতে বাধ্য। একবার ভাবুন মমতা অমর্ত্যবাবুরও রক্ষাকর্তা, আবার অনুব্রতরও। ভাবতেই শিউরে উঠছি।

অনভিপ্রেত আর অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বিতর্কে নিজেকে জড়িয়ে প্রচারের আলোয় থাকা অমর্ত্যবাবুর পুরোনো স্বভাব। এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি জানি না বিশ্বের অন্য কেউ নোবেল স্মৃতি পুরস্কার জয়ী অর্থনীতিবিদ আছেন যিনি ইচ্ছাকৃতভাব নিজেকে বিতর্কে জড়িয়ে রাখেন। তাঁকে সহনশীল আমি বলতে পারব না। একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় তাঁর একটি লেখার সমালোচনা করায় আমার একটি চিঠি ওয়েবসাইট থেকে মুছে দেওয়া হয়। বলা হয় লেখকের আপত্তির কারণেই সেটা করা হলো। মমতা যে ফাঁদে পা দিয়েছেন তা স্বেচ্ছায় না বাধ্য হয়ে ত বলতে পারব না। তবে এটা বলতে পারব বিশ্বভারতীর জমি নিয়ে মমতা বা অমর্ত্যবাবু দু'য়ে-দু'য়ে পাঁচের অঙ্ক কষার চেষ্টা করলেও সত্যের আলোয় তা চারই হবে। পাঁচ নয়। □

টাকা কি মোদীর নাকি?

খাতবদলেষু দিদি,

এই সম্বোধনে রাগ করবেন দিদি প্লিজ। আসলে আপনি এই খাতের টাকা ওই খাতে খরচ করাকে যে ভাবে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন তা দেখেই এই সম্বোধন। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আপনার সরকার মিড ডে মিল বাবদ কেন্দ্র যে টাকা দিয়েছে তার থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বগটুইতে আপনি যে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছিলেন তাও দেখা যাচ্ছে মিড ডে মিলের টাকা থেকেই দেওয়া হয়েছে। এটা বেআইনি বলছে সবাই। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে টাকা। কীসের টাকা সেটা ভাবার কোনও মানে হয় না। টাকা মানে তা খরচ করতে হবে। কীসের টাকা কোথায় খরচ হবে সেটা কেন ভাবা হবে?

কিন্তু দিদি সেটা তো আর করা যাবে না মনে হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত অংশগ্রহণে যেসব যৌথ প্রকল্প চলে, তার মধ্যে বাছাই করা কিছু ক্ষেত্রে টাকা দেওয়ার নিয়ম বদলানোর কথা ভাবছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। কাজ শেষ হওয়ার পরে ফল দেখে তবেই বরাদ্দ টাকা রাজ্যকে দেওয়া হবে, এবার এমন পথেই হাঁটতে চলেছে কেন্দ্র। এটা কী হচ্ছে দিদি? অন্য রাজ্যের কথা আলাদা কিন্তু এ রাজ্য এটা মানবে না। আপনি বলে দিন, মানব না। কেন্দ্রের টাকা দরকার নেই, কিন্তু সেই টাকা কোথায় কীভাবে আপনি খরচ করবেন তা আপনার ব্যাপার। সেটা নিয়ে মোদী সরকার ভাববে কেন?

এটা চলবে না। আসলে দিদি, প্রশাসনিক বা সরকারি কাজেও কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি 'রাজনৈতিক মনোভাব' দেখাচ্ছে। সবাই বলবে, এই নীতি তো শুধু এ রাজ্যের জন্য নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্যেও তাই হবে। ওসব শুনতে চাই না। আমাদের টাকা দিতে হবে কিন্তু খরচের হিসাব চাওয়া চলবে না।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ এবারের বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, উন্নয়নের অর্থ ঠিকমতো খরচ করতে কিছু বাছাই করা প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুরির পদ্ধতি পরীক্ষামূলক ভাবে বদলানো হবে। উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পে জলাধার নির্মাণ এবং বাড়ি পর্যন্ত জলের পাইপ গেলেই হবে না। জল বাড়িতে যাচ্ছে, তা জানার পরেই প্রকল্পের মূল অর্থ রাজ্যকে দেওয়া হবে। এই প্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য, মুখে যাই বলা হোক, কেন্দ্রীয় সরকার এক এক রাজ্যের জন্য এক এক নিয়মে কাজ করে। এবং সে ক্ষেত্রে বারবার কেন্দ্রের শাসক দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। সরকার তো দলের নয়, দেশের মানুষের! আর আমাদের দল হচ্ছে মা-মাটি-মানুষের দল। সুতরাং, টাকা দিতে হবে আগেই। কাজ হোক বা না হোক টাকা চাই। কারণ, শুধু রাজ্য নয়, আমাদের দল চালাতেও টাকা লাগে। মানুষের দলের জন্য টাকা তো কেন্দ্রকেই দিতে হবে। ঠিক বলছি কি না দিদি?

আপনার কাছেও এর পরে সবাই বলবে, আগে টাকা দিন, তার পরে কাজ করব। সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু যদি বলে বসে যে, আগে ডিএ দিন, আগে আবাস যোজনার টাকা দিন, চাকরি বিক্রির টাকা ফিরিয়ে দিন তবেই ভোট দেব। তাহলে!

জানি, ওরা বলবে, এতদিন তো আগে টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। ফল কী হয়েছে? কত ঠিকাদারের টাকা বাকি। কত কাজ হয়নি। কত টাকা পড়ে আছে। কেন্দ্র তো ঠিকই কাজ করেছে। কেন শুধু শুধু টাকা ফেলে রাখবে? তার চেয়ে কাজ করে দেখাক, তার পরে পয়সা দেবে।

কিন্তু দিদি, ও সবে কান দেবেন না। আপনি প্রতিবাদ করুন। টাকা আগে, কাজ পরে। কাজ হোক বা না হোক টাকা চাই। এটাই আমাদের দাবি। তবে দিদি তাতে একটা সমস্যাও রয়েছে। আপনার কাছেও এর পরে সবাই বলবে, আগে টাকা দিন, তার পরে কাজ করব। সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু যদি বলে বসে যে, আগে ডিএ দিন, আগে আবাস যোজনার টাকা দিন, চাকরি বিক্রির টাকা ফিরিয়ে দিন তবেই ভোট দেব। তাহলে!

না দিদি, এসব বলে বলুক। ভাবা যাবে না। আমাদের সোজা কথা, কেন্দ্রকে টাকা দিতে হবে। দিতেই হবে। হিসাব চাওয়া চলবে না। □

অতিথি কলম

অমিত শাহ

দেশের সমবায় সংস্থাগুলি প্রথম উপযুক্ত পরিচিতি পেল

দেশের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন সদ্য ঘোষিত বাজেটে সমবায় ক্ষেত্রগুলি সম্প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো অনুপ্রেরণা পাবে। দেশের চলতি 'অমৃতকালের' প্রথম বাজেটে অর্থনৈতিক উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতে সরকার বড়ো মূলধনী খরচের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর কাঠামোয় ছাড়, রাজস্ব খাতে ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছে তা দেশের দীর্ঘ লালিত উন্নত ভারতের লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ। দেশের দৃঢ় সংকল্প প্রধানমন্ত্রীর সক্ষম ও বেগবান নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় এই বাজেট বিশ্ব আঙিনার ভারতকে তার উচ্চাসন ধরে রাখার সঙ্গে দ্রুততম উন্নয়নশীল অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে অন্য দেশকেও প্রেরণা দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বাজেটকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে বলেছেন এখানে মাঝারি মাপের স্বাধীন উৎপাদক, মহিলা, চাষি, গ্রিন টেকনলজির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম দেশের বাজেটে ছুতোর সম্প্রদায়, স্যাকরা, মালবাহক এবং ছোটো স্বাধীন পেশার মানুষদের যারা জাতির উন্নয়নে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে দেশের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে তুলে ধরছেন—তাদের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ রাখা হয়েছে। স্বাধীন উৎপাদক ও শিল্পক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির উদ্যোক্তাদের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান' একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শিল্পী স্বীকৃতি। জাতির প্রতি তাদের অবদানের যোগ্য সম্মান। স্মরণে থাকবে, ২০২১ সালে একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমবায় ক্ষেত্র যারা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ডের মতো কাজ করে তাদের জন্য একটি আলাদা দপ্তর খুলেছেন। আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি এই দপ্তরের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত আছে। বাজেটে বহু উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় রয়েছে যা চলতি ভাষায় বুস্টার ডোজের কাজ করবে। উদাহরণ হিসেবে বিশাল বিশাল স্টোরেজ তৈরির মাধ্যমে কৃষকদের বিশেষ প্রয়োজনীয় সাহায্য করা যাতে মাল সংরক্ষণের সুযোগ বাড়ে এবং তারা দাম বাড়লে ঠিক সময়ে তা বিক্রির মাধ্যমে লাভ বাড়াতে পারে। এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও বিপুল আকারের শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারতেই তৈরি হয়ে উঠছে।

দেশে নতুন উৎপাদন শিল্প তৈরি করলে যেমন প্রথমে করছাড় দেওয়া হয় এখন থেকে নতুন সমবায় তৈরি করে উৎপাদন শুরু করলে সেই উৎপাদনশীল সমবায়কে উৎসাহ দিতে ১৫ শতাংশ কর ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। এই সমবায়ের স্থাপনা ৩১।৩।২০২৪-এর মধ্যে হলেই বিশেষ ছাড়ের যোগ্যতা পাবে সমবায় সমিতিগুলি।

নতুন ঘোষিত নিয়মে সমবায় ব্যাংকে মাথাপিছু সদস্যের জমার পরিমাণ ও ঋণদানের মাত্রা ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষে বর্ধিত করা হয়েছে। প্রাইমারি কৃষি সমবায় সমিতিও এই ক্ষেত্রের গ্রামীণ ব্যাংকগুলিও এই বর্ধিত মাত্রায় কাজ করবে। অজস্র চিনি মিলগুলি বিগত ১৭ সাল থেকে কৃষকদের দেওয়া ১০ হাজার কোটি টাকা সরকারের কাছে দাবি করে আসছিল সেই টাকা এখন খরচা হিসেবে দেখাবার অনুমতি দিল সরকার। এর ফলে আদতে কৃষকরাই দশ হাজার কোটির ছাড় পাবে।

> "আমি নিশ্চিত এই সমবায়ে আমূল পরিবর্তনই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে।"

দেশে যদিও সমবায় সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তবুও কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি ও প্রাধান্য বেশি আছে। এই নিয়ে বেশ তারতম্য রয়েছে। এই অঞ্চল বৈষম্যকে সংশোধন করতে নতুন জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা হচ্ছে। কাজটি প্রায় সমাপ্তির মুখে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে যারা একটি জাতীয় সমবায় নীতি প্রণয়ন করবে যেখানে হাতে কলমে কাজ করা সমবায় প্রতিনিধিও কিছু থাকবে। এর ফলে দেশের অর্থনীতির তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সঙ্গে সর্বোচ্চ আইন প্রণেতাদের একটি সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হবে। দেশের অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও প্রত্যক্ষ হবে। এই সূত্রে আরও একধাপ এগিয়ে সরকার একটি সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ করছে যাতে যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষিত মানুষ সমবায় ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রয়োগ করে চাষিদের সাহায্য করতে পারে। প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি-কে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করা ছাড়া বহুমুখী হতে পারে যাতে দেশের বহুবিধ প্রয়োজন মেটে সরকার সেই পথে এগোচ্ছে। এবং এই বহুমুখীনতা সমবায়কে আরও বর্ধিত লাভের মুখ দেখাবে। এই সূত্রে সম্প্রতি সমবায়মন্ত্রক, আইটি মন্ত্রক,

NABARD ও CSC e-governance services India Ltd.-এর মধ্যে একটি বহুপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই MOU-টির মাধ্যমে বর্তমানের PACS-গুলি চুক্তির ফলে সিএসসি (কমন সার্ভিস সেন্টার) তৈরি হবে তাদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারবে। ৬৩ হাজার কৃষি সমবায় সমিতির কম্পিউটারাইজেশনের কাজ ইতিমধ্যেই এগিয়ে চলেছে। এই খাতে খরচ হচ্ছে ২৫১৬ কোটি টাকা। এগুলি কোনো হাওয়ায় ভাসানো প্রস্তাব নয়। বেশ কয়েক দশক পরে জাতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা এই প্রথম স্বীকৃত ও সম্মানিত হলো। অতি নিম্ন আয় ও অর্থনৈতিক সঙ্গতির গ্রামীণ গরিব মানুষগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে ঋণদান করে তাদের বাঁচার রাস্তা সুগম করে গ্রামীণ চাষভিত্তিক ও অচাষভিত্তিক উভয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকেই উপযুক্তভাবে ধরে রেখেছে সমবায় প্রথা।

সমবায় সমিতিগুলি ছোটোখাটো উদ্যোগপতিদের তুলনামূলক ভাবে সস্তাদামে কাঁচামাল সংগ্রহে সাহায্য করে তাদের উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়। বাস্তবে এই ধরনের উৎপাদকদের কাছে সরাসরি ক্রেতাদের উপস্থিত করে মাঝখানের দালালদের হাত থেকে তাদের বাঁচিয়ে দেয়। উৎপাদকরা ভালো দামে সামগ্রী বেচতে পারে, ক্রেতাও দালাল কমিশন ছাড়া কম দামে মাল পায়। এই সমবায় অনায়াসে শহর-গ্রাম দূরত্ব বুজিয়ে দিয়ে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বড়ো বড়ো শিল্প উৎপাদন সংস্থাগুলিতে কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং অর্ডার মোতাবেক মাল দিয়ে শেষমেশ দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়ায় পরোক্ষে বড়ো অংশ নেয়।

এছাড়াও সমবায় সংস্থাগুলির আরও বড়ো বড়ো সাফল্যের গল্প আছে। সকলেই জানেন দুগ্ধজাত পণ্যের ও দুগ্ধের যে সমবায় বিপ্লব দেশে হয়েছে 'আমুলে'র মুখে ফেরা নাম তার প্রমাণ। এরই পাশে রয়েছে 'লিজ্জত পাঁপড়'। IFFCO ও KRIBHCO নামের বিশাল সংস্থাগুলি দেশের কৃষি ক্ষেত্রের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়া রাজ্যস্তরে আর্বান সমবায়, সমবায় ব্যাংক, PACS, বহু হাউজিং কোঅপারেটিভ, মৎস্য উৎপাদন কোঅপারেটিভ প্রভৃতিরা গ্রামীণ স্তরে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে নিরলস প্রয়াস করে চলেছে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে আমাদের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ মানুষের কোনো না কোনো সমবায়ের সঙ্গে যোগ আছে। দেশের মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ PACS (Primary Agri Credit Society)-এর আওতায় আছে। দেশে ৩৩টি রাজ্যভিত্তিক সমবায় ব্যাংক, ৩৬৩টি জেলাভিত্তিক সমবায় ব্যাংক এবং ৬৩ হাজার PACS আছে। হিসেব অনুযায়ী দেশের কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত অর্থের ১৯ শতাংশ সমবায়ের। এর মধ্যে সার বিতরণে ৩৫ শতাংশ, সার উৎপাদনে ৩০ শতাংশ, ৪০ শতাংশ চিনি উৎপাদন, ১৩ ও ২০ শতাংশ যথাক্রমে গম ও ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। এছাড়া ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আরও ৫০০ সমবায় সরাসরি বিক্রেতার মাধ্যমে কেনা বেচা করে। এতে ৪০ লক্ষ বিক্রেতা জড়িত। এই কারণে আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী সীতারামণকে এই ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন করার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিজ্ঞাবাক্য 'সহযোগিতাই সমৃদ্ধি'র মাধ্যমে সমবায়কে একেবারে মহাগুরুত্বের স্থানে এনে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত এই সমবায়ে আমূল পরিবর্তনই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে।

(লেখক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা সম্পর্ক প্রমুখ দিবাকর চক্রবর্তীর পিতৃদেব তথা অখণ্ড বাঁকুড়া জেলার প্রাক্তন জেলা সঙ্ঘচালক, পরে বিষ্ণুপুর মহকুমা সঙ্ঘচালক মানিকলাল চক্রবর্তী গত ৩ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ১৯৬০ সালে সঙ্ঘকাজে যোগদান করে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। সদালাপী, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করা মানিকদা ছিলেন স্বয়ংসেবকদের প্রেরণাদাতা। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। রেখে গেছেন তাঁর সহধর্মিণী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা।

* * *

আলিপুরদুয়ার জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অখিল চন্দ্র সরকার গত ২ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ভারতীয় বায়ুসেনা থেকে অবসর নিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কর্মরত ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা কার্যবাহ, দিনহাটা মহকুমা সঙ্ঘচালক ও আলিপুরদুয়ার জেলা ভাগ হওয়ার পর প্রথম জেলা কার্যবাহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দিনহাটা মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দিনাজপুর বিভাগ সঙ্ঘচালক তপন কুমার দাস গত ২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

মোদী সরকারের গতিশীল আর্থিক উন্নয়নের বাজেট

এ বারের বাজেট ভারসাম্যযুক্ত আর্থিক প্রগতি ও স্থায়ী বৃদ্ধির গতিশীল বাজেট যা বিরোধীদের সমালোচনার মুখ বন্ধ করেছে।

আনন্দ মোহন দাস

প্রত্যেক দেশে আর্থিক বাজেট নিয়ে সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের এক বিশেষ কৌতূহল থাকে। বর্তমান বিশ্বে আর্থিক ডামাডোলে ভারতের বাজেট পেশ নিয়ে সারা বিশ্বের সংশ্লিষ্ট আর্থিক মহলে এক বিশেষ কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে দশম স্থান থেকে আজ পঞ্চম স্থানে পৌঁছে গেছে। আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে ভারত আর্থিক ভিত্তিতে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করবে বলে বিশ্ব আর্থিক সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। সেই জন্য দেশের বুনিয়াদি আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন যা এককথায় প্রশংসনীয়। বলাবাহুল্য, এবারের বাজেট কোনো নির্বাচনমুখী বাজেট নয়, বরং আর্থিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের বাজেট। এবারের বাজেট পরিকাঠামো উন্নয়নের বাজেট, এবারের বাজেট ভারসাম্য যুক্ত দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক উন্নয়নের বাজেট। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে এই হলো কেন্দ্রীয় সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। নির্বাচনী চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি ত্রাণের বাজেট না করে পরিত্রাণের বাজেট করেছেন। বর্তমান বাজেট গরিব, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও জনজাতিদের উন্নয়নের বাজেট। এবারের বাজেট গ্রামীণ বিকাশের বাজেট। বেশিরভাগ আর্থিক বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা বাজেটকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও গরিব মধ্যবিত্তের স্বপ্ন পূরণের বাজেট হিসেবে অভিহিত করেছেন। পরিসংখ্যানগত বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমেয়, সরকার স্বাধীনতার অমৃতকালে উপরিউক্ত লক্ষ্য পূরণে কতটা আন্তরিক। এবারের বাজেট সপ্তর্ষি অর্থাৎ ৭টি বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাজেট। উল্লেখযোগ্য বাজেট প্রস্তাবগুলি হলো :

(১) **মূলধনী ব্যয় :**

(ক) সরকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ৩৩ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করবে বলে বাজেটে উল্লেখিত হয়েছে। মূলধনী খাতে এই বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ একটি যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। সরকারি বিনিয়োগের ফলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরবর্তীকালে বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ও সরকারের আয় বৃদ্ধি হবে। ভারী ও লঘু উদ্যোগ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পণ্যগুলির বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত সিমেন্ট, স্টিল-সহ নির্মাণ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যগুলির চাহিদ বৃদ্ধি পাবে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

(খ) **ন্যাশনাল হাইওয়ে :** পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার পরিবহণ, রাস্তা ও হাইওয়ের জন্য ২৫ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ২৭০০০০ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব করেছে যা সর্বকালীন রেকর্ড। উচ্চমানের হাইওয়ে নির্মাণের ফলে পরিবহণে গতি আসবে, দ্রুত মাল পরিবাহিত হবে এবং পরিবহণ খরচ হ্রাস পাবে। উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সম্ভব হবে এবং সরকারের আয় বৃদ্ধি পারে।

(গ) **রেল বরাদ্দ :** বাজেটে রেলের জন্য ৪৮ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ২৪০০০০ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই খাতে উচ্চমানের ট্রেন (বন্দে ভারত, বুলেট ট্রেন, হাইস্পিড, সেমিহাই স্পিড ট্রেন), নতুন রেলপথ, আধুনিক সুবিধাযুক্ত বিশ্বমানের রেলস্টেশন, পণ্য পরিবহণে আধুনিক মানের ওয়াগান, হাইড্রোজেন শক্তি পরিচালিত ট্রেন, বন্দে মেট্রো প্রভৃতি নির্মাণে ব্যয় করা হবে। ১০০টি ক্রিটিক্যাল পরিবহণ পরিকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করে যাত্রাপথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বন্দর, কয়লা, স্টিল, সার ও খাদ্যশস্য দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

এইসব পরিকাঠামো নির্মাণ ও বিনিয়োগের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান, উচ্চমানের পরিষেবা, শিল্পের উপযোগী প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি,

বিদেশে পণ্য রপ্তানি ও সরকারি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগও বৃদ্ধি হবে।

(২) **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা :** এই যোজনায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৬৬ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৭৯০০০ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আরও বেশি পরিমাণে আর্থিক সংখ্যায় গরিব মানুষের গৃহ নির্মাণ সম্ভব হবে। আরও ৬০ লক্ষ বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। তার ফলে গৃহ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত শিল্পে চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণে গরিবের মাথার উপর ছাদ নির্মাণ বা পাকা বাড়ি নির্মাণ বাজেটে উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

(৩) **এয়ারপোর্ট নির্মাণ :** বাজেট দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সারা দেশে স্থানীয় ভিত্তিতে ৫০টি এয়ারপোর্ট ও হেলিপোর্ট নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও রোজগার বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রুত যোগাযোগের পথ খুলে যাবে।

(৪) মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে সরকার প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা প্রকল্পে ৬০০০ কোটি টাকা খরচ করার প্রস্তাব করেছে। এর ফলে উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীরা উপকৃত হবেন এবং এদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ত হবে।

(৫) বাজেটে ১৫৭টি নতুন মেডিক্যাল ও নার্সিং কলেজ নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডাক্তার ও নার্সদের অভাব পূরণ হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

(৬) সারা দেশে ভালো বই পড়ার জন্য শিশু ও কিশোরদের জন্য ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি নির্মাণ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত এই ধরনের ডিজিটাল লাইব্রেরি নির্মাণের কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিজিটাল লকার ব্যবস্থা উন্নয়নেও জোর দেওয়া হয়েছে।

(৭) শিক্ষা খাতে সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ ১১২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে। সমগ্র শিক্ষা মিশন, পিএম পোষণ ও দক্ষ শিক্ষক নির্মাণে ডিজিটাল শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা বাজেটে উল্লেখিত হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের (Skill development) জন্য ৩০টি আন্তর্জাতিক স্কিল উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এর ফলে কর্ম সংস্থান ও দক্ষ কর্মী নির্মাণ সম্ভব হবে। পিএম কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০ চালু করার বাজেট প্রস্তাব রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১০০টি ৫ জি ল্যাব তৈরি করার বাজেট প্রস্তাব রয়েছে।

(৮) শহর বিকাশের জন্য প্রতি বছর ১০০০০ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব রয়েছে। তার ফল শহরগুলির আধুনিকীকরণ ও সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

(৯) কিছু ক্ষেত্রে বিদেশি যন্ত্রাংশ আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি কম করায় মোবাইল, টিভি, খেলনা, এসি, ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর ও সাইকেল প্রভৃতি দামে সস্তা হবে। এর ফলে বাজারে এই ধরনের ভোগ্য পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

(১০) কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধি পাবে। যেমন সিগারেট, বিদেশি রান্নার সরঞ্জাম, বিদেশি চিমনি ইত্যাদি।

(১১) বাজেটে বরিষ্ঠ নাগরিকদের সুদ বাবদ আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকে 'সিনিয়র সিটিজেন 'স্কিমে' মেয়াদি সঞ্চয়ে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ডাকঘরে মাসিক আয় প্রকল্পে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ ৪.৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯ লক্ষ টাকার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে যারা সুদভিত্তিক আয়ের উপর নির্ভরশীল তারা উপকৃত হবেন। অতিরিক্ত অর্থ হাতে আসায় বাজারে উপভোক্তার খরচ করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের জোগান থাকবে। তাছাড়া ব্যাংকগুলির কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা হলে কম সুদে ঋণ দেবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা উপলব্ধ হবে।

(১২) বাজেটে মহিলাদের জন্য 'মহিলা

ফঃ ২

সম্মান জমা পত্র' নামে একটি দু' বছরের মেয়াদি সর্বোচ্চ দু' লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৭.৫০ শতাংশ সুদে জমা প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। সুতরাং বাজেটে মহিলাদের সুবিধা প্রদানের প্রতিও নজর দেওয়া হয়েছে।

(১৩) ব্যক্তিগত আয়করে নতুন কর ব্যবস্থায় ৭ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত আয়কর ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং আয়করের হারেও পরিবর্তন করে কর কম করা হয়েছে। ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে খরচ করার জন্য অতিরিক্ত টাকার জোগান থাকবে এবং বাজারে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

(১৪) কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে প্যানকার্ড বিনা টাকা তোলার ক্ষেত্রে করের হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে এবং অবসরে আয়কর মুক্ত ছুটি নগদীকরণের টাকার পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সুতরাং করমুক্ত অর্থের জোগান বৃদ্ধির ফলে কর্মচারীরা উপকৃত হবে এবং বাজারে ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি হবে।

(১৫) এনার্জি ট্রান্সমিশনের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণে ৩৫০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের বাজেট প্রস্তাব রয়েছে। তার ফলে সৌর শক্তি-সহ গ্রিন এনার্জি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বায়ু দূষণ হ্রাস পাবে। যে কোনো পরিকাঠামো নির্মাণে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়ে থাকে।

(১৬) ৭৪০টি একল বিদ্যালয়ে ৩৮৮০০ শিক্ষক ও সহায়ক নিয়োগ করার বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৩৫০০০০ জনজাতি মানুষ উপকৃত হবেন। তপশিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়নে খরচের জন্য আরও ১৫০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে।

(১৭) বাজেটে কেওয়াইসি (kyc) পলিসি সরলীকরণ এবং ব্যবসার জন্য একমাত্র প্যান কার্ডই উপযুক্ত প্রমাণপত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১৮) ১০০০০ বায়োইনপুট গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের কথা বাজেটে উল্লেখিত হয়েছে।

(১৯) স্বনির্ভর ক্লিন প্লান্ট স্থাপনের জন্য ২২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার ফলে গঙ্গা ও অন্যান্য নদীগুলিকে দূষণমুক্ত রাখাতে সহজ হবে।

(২০) বায়ুদূষণ মুক্ত করতে ১৫ বছরের বেশি পুরানো গাড়ি বাতিল করার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ২০৭০ সালের মধ্যে দেশকে কার্বনমুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

(২১) কোভিডকালে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য রাজ্যগুলিকে ১ লক্ষ কোটি টাকা ৫০ বছর মেয়াদি সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান বাজেটে তা বৃদ্ধি করে ১৩০০০০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ফলে রজ্যগুলি আর্থিক দিক থেকে অভাব মুক্ত হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।

(২২) বিদেশি সম্পত্তি ক্রয় করতে অনেকে বিদেশে টাকা পাঠায়। এই ধরনের প্রবণতা হ্রাস করতে উৎসমুখে ২০ শতাংশ কর আদায় করার প্রস্তাব বর্তমান বাজেটে রাখা হয়েছে। এর ফলে বিদেশি সম্পত্তি ক্রয় করতে কর প্রদান করতে হবে এবং সরকারের আয় বৃদ্ধির পথ খুলে যাবে।

(২৩) বাজেটে ই-কোর্ট ব্যবস্থার জন্য ৭০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জনগণের সুবিধার্থে দ্রুত পরিষেবা প্রদানে ই-কোর্টের মাধ্যমে আদালতের কাজকর্মে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(২৪) সহজ শর্তে কৃষি ঋণের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২০ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে স্টার্টআপ ও বিকেন্দ্রিত স্টোরেজ ব্যবস্থা নির্মাণের জন্যও বাজেট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যার ফলে কৃষকরা উৎপাদিত দ্রব্যের যথাযথ সংরক্ষণ করে বাজারে উপযুক্ত দাম পাবেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করবে।

(২৫) ২০৪৭ সালের মধ্যে সিকল সেল অ্যানিমিয়া দূর করার জন্য বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে। ওষুধ ক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নয়ন ও আবিষ্কারের জন্যও নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

(২৬) বাজেটে ম্যানহোল পরিষ্কার করার অমানবিক কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে আধুনিক মেশিনের সাহায্যে করার সংকল্প নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বহু সাফাই কর্মী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং অমানবিক কাজ থেকে রেহাই পাবে।

(২৭) অনলাইন গেমস ও লটারি বিজেতার টাকার পরিমাণ থেকে ৩০ শতাংশ কর কেটে নেবার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পূর্বে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় ছিল কিন্তু বর্তমানে এই ছাড়টি বন্ধ করা হয়েছে। ফলে এই ধরনের গেম ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং সরকারের আয় বৃদ্ধি হবে।

(২৮) পর্যটন শিল্পের বিকাশে ৫০টি পর্যটন কেন্দ্রকে বিকশিত করার উপর বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ২৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে ১৪১২ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং পর্যটনে জনগণ আকৃষ্ট হবে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও পর্যটন শিল্পের উন্নতি ঘটবে।

(২৯) ডাক ও টেলিকম শিল্পের জন্য বাজেটে ১.২০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং বিএসএনএল-কে পুনুরুজ্জীবিত করার জন্য মূলধন খাতে ৫২৯৩৭ কোটি টাকা এর মধ্যে ধরা হয়েছে। সুতরাং ডাক ব্যবস্থা ও টেলিকম শিল্পের বিকাশে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।

(৩০) বাজেটে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৮৯১৫৫ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ২৯৮০ কোটি টাকা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য পৃথক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। জতীয় স্বাস্থ্য মিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২৯০৮৫ কোটি টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ৭২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে অগ্রাধিকার মোদী সরকারের প্রাথমিকতা বাজেটে প্রমাণিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, এ বারের বাজেট ভারসাম্যযুক্ত আর্থিক প্রগতি ও স্থায়ী বৃদ্ধির গতিশীল বাজেট যা বিরোধীদের সমালোচনার মুখ বন্ধ করেছে। □

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সবচেয়ে বড়ো উপহার মোদীনোমিক্স

সুদীপ্ত গুহ

দেশবাসী জনধন প্রকল্পে ব্যাংকের খাতা না খুললে কোভিড অতিমারীর সময়ে গরিবের ঘরে কীভাবে কেন্দ্র সরকার টাকা পাঠাতেন? সরকার কীভাবে মেঘালয়, রাজস্থান বা তেলেঙ্গানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে টাকা পাঠাতেন? কীভাবে গ্যাস ভরতুকি, কৃষি ভরতুকি পেত গরিব মানুষ? ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একসময় বলেছিলেন সরকার ১ টাকা খরচ করলে গরিব মানুষ পায় ১৫ পয়সা। কিন্তু কেন? কারণ মানুষের কাছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ফলে সরকারের ১০০ টাকা দিল্লি থেকে সুদূর দিনহাটা বা গঙ্গারামপুর বা ঘাটালে পৌঁছানোর আগে বাবু ও নেতাদের পকেটে চলে যেত ৮৫ টাকা। আমরা দেখেছি এক সময় আমাদের বিভিন্ন নেতা বিধবাভাতার থেকেও কমিশন নিতেন। ১৯৬৯-এ দেশের ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করার মূল কারণ দাবি করা হয়েছিল দেশের দরিদ্রতম মানুষকেও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে আনা। কিন্তু নোটবন্দির সময় সংসদে দেশের ভূতপূর্ব যোজনা আয়োগের প্রধান তথা রিজার্ভ ব্যাংক প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ বললেন, ২০১৬ পর্যন্ত নাকি দেশের ৪০ শতাংশ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ঘটনা হলো ২০১৪ পর্যন্ত ৫০ শতাংশ মানুষেরই ছিল না। কেন্দ্রের দেওয়া 'গরিবি হাটাও' প্রকল্পের বিভিন্ন অনুদান তাহলে কোন গরিবের দারিদ্র্য দূর করেছে সহজেই অনুমেয়।

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার দিকে জোর দিলেন। শুরু করলেন জনধন যোজনা। সঙ্গে দিলেন জীবন বিমা, দুর্ঘটনা বিমা ও স্বাস্থ্য বিমার কার্ড। এই প্রথম দেশের প্রান্তিকতম মানুষ পেল ব্যাংকিং এবং বিমার স্বাদ। মানুষ জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছে যে কোনো ব্যাংকে। পাচ্ছে এটিএম এবং ডেবিট কার্ড। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ১৭.৯ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয় এবং সেখানে জমা হয় ২২৯০১ কোটি টাকা, আর ২০২২-এ মোট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫০ কোটি, যার ৫০ শতাংশ মহিলাদের। আর মোট অর্থ জমা হয় ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা। সরকার স্কলারশিপ, বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা এবং বিভিন্ন আপৎকালীনভাতা বাবদ অ্যাকাউন্টে পাঠায় ২৫ লক্ষ কোটি। এছাড়া মানুষ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে আসায় মুক্তি পাচ্ছে মহাজনদের অত্যাচার থেকে। ছোটো ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সুদ তাঁদের গুনতে হতো প্রতি সপ্তাহে, এখন সেটা দিতে হয় সারা বছরে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে জিনিস ঘটে গেছে, তা হলো জনধন খাতাকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে জুড়ে দেবার ফলে সরকার ২০১৯-এ জানতে পারে যে দেশের ১১২৭৮টি গ্রাম আছে যেখানে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাংক নেই। মাত্র দুই বছরে সরকার এই সংখ্যাকে নামিয়ে আনেন ২৫৬-তে। খুব শীঘ্রই শূন্যতে পৌঁছাবে। ব্যাংক জাতীয়করণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রতিটি গ্রামে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান। সেই লক্ষ্যপূরণ

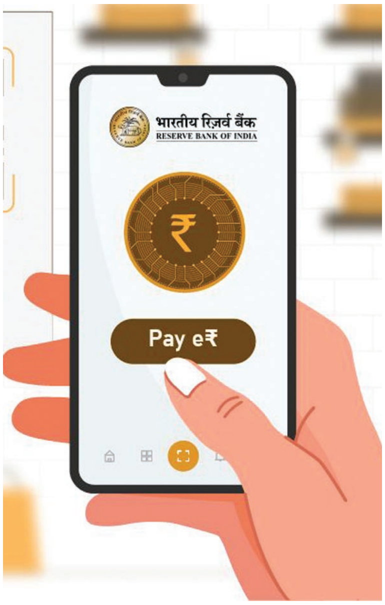

হয় ৫২ বছর পরে জনধন প্রকল্পের দৌলতে।

এখন 'জনধন' যোজনাও কি তাহলে শুধুই আরেকটা এই ধরনের জনমোহিনী প্রকল্প? শুধু কি দরিদ্র মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নাকি দেশের অর্থব্যবস্থা শক্তিশালী করতেও এর ভূমিকা আছে? দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট মূলধন বৃদ্ধির, সরাসরি কেন্দ্র সরকারের অনুদান দরিদ্রের পকেটে পৌঁছানো ছাড়াও আরও অনেক মূল্য সংযোজন হয়েছে এই জনধন প্রকল্পের মাধ্যমে। যার মধ্যে একটি হলো 'রুপে' নামক পেমেন্ট নেটওয়ার্ক সিস্টেমে রাজত্ব করেছে ভিসা ও মাস্টারকার্ড। চিরাচরিত চেক সিস্টেম থেকে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হতেই ভিসা ও মাস্টারকার্ড এই বাজার দখল করে। এই লেন-দেন তাঁদের মোট ফি ১.৫ থেকে ৩.৫ শতাংশ পর্যন্ত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অনুদান থেকে ছোটো ব্যবসার ক্ষেত্রে এই অঙ্কের টাকা যদি শুধুমাত্র কমিশনেই বেরিয়ে যায়, তবে সেটা দেশের জন্য একটা বড়ো ধাক্কা মনে করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ছোটো ব্যবসায়ীর কাছে এটা একটা বড়ো অঙ্ক। প্রথমে জনধন অ্যাকাউন্টের সবাইকে রুপে কার্ড দিয়ে বাজারে রুপের জোগান বাড়িয়ে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ফি মাত্র ০.৯ শতাংশ। নোটবন্দির পরে যখন ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর দেশের প্রান্তিক মানুষটিও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, রুপের লেন-দেন বাড়ে। আরও বাড়ে গ্রহণযোগ্যতা। এখন আমাদের দেশে ৩৪ শতাংশ কার্ড এই 'রুপে'। অর্থমন্ত্রক ব্যাংকগুলিকে ১৩০০ কোটি টাকা ভরতুকি দেয় এই কার্ডের খরচ বাবদ। ভিসা ও মাস্টারকার্ডের বিরুদ্ধে মার্কিন ফেড সরকারের কাছে অভিযোগ করে। ভারত ছাড়াও সিঙ্গাপুর, ভুটান, মালদ্বীপ, বাহরিন, ইউএই, সৌদি, মায়ানমার, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া এই সিস্টেমে ব্যবহার করছে। দেশের বাড়ছে আয়। আর এই রুপের সাফল্যর হাত ধরে আরও একটি সাফল্য আসে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায়। সেটা হলো ইউপিআই। ইউপিআই আত্মনির্ভরতার দিকে এক বড়ো পদক্ষেপ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আরও একবার বিশ্বের প্রতিটি দেশকে আত্মনির্ভর হওয়ার সতর্কবাণী দিয়ে গেল। ইউক্রেনকে দিতে হলো প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর না হওয়ার দাম, আর রাশিয়াকে হয়তো আগামীদিনে দিতে হবে আর্থিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর না হওয়ার দাম। আত্মনির্ভরতা কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এ এক কঠিন রাস্তা, যেখানে সকলকে হাঁটতেই হবে। যে দেশ পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা থাকার পরেও ১০০ শতাংশ চিপ, ৯০ শতাংশ জ্বালানি, এমনকী ৬০ শতাংশ ভোজ্য তেল বিদেশ থেকে আমদানি করে, সেই দেশ আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে কার সঙ্গে দর কষবে? সন্ত্রাসবাদী হামলা করলে মিন মিন করে বড়োভাইকে নালিশ করা ছাড়া কী করতে পারে সেই দেশ? জাকির নায়েকের এক নির্দেশে মালয়েশিয়া খাবার তেলের দাম বাড়ালে আমাদের কষ্টার্জিত কোটি কোটি ডলার চলে যায় সেই দেশে। মার্কিন মুলুক মধ্যপ্রাচ্যে বোমাবর্ষণ করলে দাম বেড়ে যায় আমাদের জ্বালানি তেলের। কাল যদি চিপ প্রস্তুতকারক তাইওয়ানকে চীন আক্রমণ করে, ভারতকে ল্যাপটপ, মোবাইল, বাল্ব, গাড়ি বানাতে চিপ দেবে কে? আর সেই জন্যই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। আত্মনির্ভর হবার জন্যই গত আট বছর ভারত সরকার ল্যাটিন আমেরিকার লিথিয়াম খনির মালিকানার জন্য দৌড়েছে, দেশের দরিদ্রতম মানুষের ঘরে ফর্টিফায়েড চাল পাঠিয়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করার ব্রত নিয়েছে মার্কিন ওষুধ লবির দাদাগিরি থেকে মুক্তি পেতে। উত্তরপ্রদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম চিপ কারখানা খুলেছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার জন্য জমি দিয়েছে। সামরিক হেলিকোপটার বিক্রি করছে বন্ধু দেশকে। প্রান্তিক মানুষের ঘর ও টয়লেট বানিয়ে জীবনের মান বাড়িয়েছে, মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষায় বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে গতি এনেছে, প্রযুক্তির প্রয়োগে, শক্তিশালী করেছে ব্যাংকিং ব্যবস্থার, ২০০টি শিক্ষা বিষয়ক চ্যানেল খোলা হয়েছে, স্কিল ইন্ডিয়া মিশনে বাড়ানো হয়েছে দক্ষতা। এর বদলে শুধু টাকশাল থেকে টাকা ছাপিয়ে রেশন দোকানে বণ্টন করলে হয়তো জনপ্রিয়তা অনেক বাড়তো, ভোট পাওয়া যেত আরও বেশি, কিন্তু দেশটা যে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে যেত! ইউক্রেনের মতো দশা হওয়া সময়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তার রাস্তা ছেড়ে আত্মনির্ভরতাকেই বেছে নিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। আর এই পথে আরেক শক্তিশালী পদক্ষেপ ইউপিআই লেন-দেন ব্যবস্থা, যা এসডব্লুউআইএফটি ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে উঠে আসবে খুব শীঘ্রই।

এখন এসডব্লুউআইএফটি কী? ইউপিআই-ই বা কীভাবে তার জায়গা নেবে? আজকের দিনে আন্তর্জাতিক আর্থিক লেন-দেনের বৃহত্তম মাধ্যম এসডব্লুউআইএফটি এবং এর চাবিকাঠি আছে পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছে। বেলজিয়াম জন্ম দিলেও আজ মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এর নিয়ন্ত্রক। কিন্তু মার্কিন সরকার কোনো দেশের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তার প্রভাব পড়ে সেই দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা অন্যান্য দেশেও। যেমন ২০১২-তে ইরানের উপর মার্কিন এসডব্লুউআইএফটি নিষেধাজ্ঞায় ভুগেছিল ভারতও। তাই আত্মনির্ভর ভারত যাত্রায় ২০১৬-তে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তার নাম ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেম। সুরক্ষিত, দক্ষ, অভিগম্য, সর্বব্যাপী এক ইলেকট্রিক লেনদেন মাধ্যম।

যেখানে প্রেরকের নাম, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর কিংবা কোড ছাড়া নগদ লেন-দেন এসডব্লুউআইএফটি ব্যবস্থায় সম্ভব নয়, সেখানে ইউপিআই-তে শুধু প্রেরকের ইলেকট্রিক ঠিকানা জানলেই চলে। খুব কম পড়াশোনা করা এবং প্রযুক্তি জানা ব্যক্তির কাছেও সহজতম রাস্তা। রাশিয়া ও চীন অনেক চেষ্টা করেও এতো সহজ একটা সমান্তরাল লেন-দেন ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার উপর এসডব্লুউআইএফটি-এ নিষেধাজ্ঞা জারি করায়, ইউপিআই কূটনীতি ভারতকে অন্যতম রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তিতে পরিণত হবার সুযোগ দেয়। ফিডেলটি, গুগল-সহ বহু সংস্থা এই ভারতীয় লেন-দেন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। ইউরোপের যেসব দেশ রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভর করে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর তাঁদের ইউপিআই-এর মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে লেন-দেনের কথা ভাবতে হতে পারে। তাছাড়া ইউপিআই-এর লেনদেন খরচ এসডব্লুউআইএফটি-এর চেয়ে কম। সিঙ্গাপুর ইউই-সহ বহুদেশ ভারতের সঙ্গে কথা শুরু করছে এই পরিষেবা নেওয়ার জন্য। চীন ও রাশিয়া এসডব্লুউআইএফটি- এর বিকল্প তৈরিতে যখন ব্যর্থ, তখন ইউপিআই- এর বিশ্বজয় সময়ের অপেক্ষা। আগামীদিনে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অন্যতম হাতিয়ার হতে চলেছে এই প্রযুক্তি।

সরকারের অপর সাফল্য ই-রুপি, যা পরীক্ষামূলকভাবে ২০২১- এর আগস্টে আনা হয়। এটা ডিজিটাল ভাউচার। বিভিন্ন বেসরকারি

কোম্পানি যেমন তাদের কর্মীদের বিগবাজার কিংবা zomato-র ভাউচার দেয়, তেমনই। আরবিআই প্রধান ড. শক্তিকান্ত দাশ ক্রিপটো কারেন্সির ব্যাপারে তার অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন কিছুদিন আগে। এখানে সরকার JAM TRINITY পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ জনধন-আধার-মোবাইল পদ্ধতি। কিন্তু ই-রুপির প্রয়োজন কী? সরাসরি ব্যাংকে টাকা পাঠালেই তো হতো? মোদীজী জনধন অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে নেতা ও বাবুদের কমিশন বন্ধ করেন। কিন্তু সেই টাকা সঠিক ভাবে খরচা হচ্ছে তা কীভাবে জানবে বা নির্দিষ্ট করবে সরকার? এখানেই এই ই-ভাউচারের প্রয়োজন। সরকার অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কিংবা নারীদের স্বাস্থ্য খাতে যে খরচ দেন, সেটা দেখা যায় অন্য কাজে খরচ হয়ে যায়। বাড়ির পুরুষরা বহুক্ষেত্রে সেই টাকা বাজে খরচ করে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই ই-রুপি কোথায় খরচ করা যাবে সেটা ঠিক করে দেবে সরকার। যেমন কলেজের ফি, কিংবা বইয়ের দোকান কিংবা মহিলা বা শিশুদের ওষুধ কিংবা হাসপাতাল। এতে অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ হবে, বলা যায় না। কিন্তু অনেকটাই কমবে। শুধু একটা এসএমএস কিংবা কিউআর কোড দেখাতে হবে লেন-দেনের সময়। আমেরিকা, সুইডেন থেকে কলম্বিয়া চিলি অনেকেই এই ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে আজকাল। এনপিসিআই, অর্থ দপ্তর, নারী ও শিশু মন্ত্রক মিলে এই ব্যবস্থা চালু করছে এবং এটা ডিজিটাল কারেন্সির প্রথম পদক্ষেপ। ই-রুপি চালু করলে সরকার জেনে যবে আগামীদিনে ডিজিটাল কারেন্সি চালু করলে কী কী সমস্যা হতে পারে।

কালো টাকার রং কিন্তু কালো নয়। ২০১৮-র আগে সুইস ব্যাংকের সঙ্গে ভারত সরকারের তথ্য বিনিময় সম্ভব ছিল না। তবে কালো টাকার রমরমা বন্ধ করতেই হবে দেশের দরিদ্রতম মানুষকে কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে বাঁচাতে। জনধন প্রথম ধাপ। এরপর নোটবন্দি, জিএসটি, আইবিসি, রেরা। মুম্বাইয়ের প্রোমোটাররা একসময় ৫০ শতাংশ ক্যাশ না দিলে ফ্ল্যাট বিক্রি করতো না। আজ তারা ক্যাশ নেন না। এবার চালু ই-রুপি। ভাউচার আকারে। সরকারের পরের আর্থিক সংস্কার সিবিডিসি অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি। এটা কিন্তু ই-রুপির মতো JAM TRINITY সিস্টেম নয়। এখানে সরাসরি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে ইলেকট্রনিক খাতা খোলা। কোনো ব্যাংকে খাতা না খুললেও চলবে। মোবাইল ওয়ালেটে টাকা থাকবে। লেন-দেন বাবদ খরচা নেই। দুই ধরনের সিবিডিসি ব্যবস্থা থাকবে। এক, খুচরো, দুই পাইকারি। প্রথমটি সাধারণ গ্রাহকদের জন্য। দ্বিতীয়টি ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক সংস্থার জন্য। এই ব্যবস্থার প্রথম সুবিধা হলো, সরকারের টাকা ছাপানোর খরচ বাঁচলো এবং সঙ্গে রক্ষা পেল পরিবেশ। ব্যাংক ডুবলে সাধারণ ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি নেই। কোনো দুর্নীতি হলে ধরা সহজ। বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো সহজ এবং SWIFT কমিশন লাগবে না এক্ষেত্রে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে কথা বলছে ভারতীয় সিবিডিসি তাঁদের দেশে ব্যবহারের জন্য। এই পদ্ধতি চালু হলে পাশ্চাত্য নিষেধাজ্ঞা থেকে আমরা নিজেদের বাঁচাতে পারবো। আত্মনির্ভরতার দিকে আরেকটি পদক্ষেপ।

JAM Trinity, রুপে, UPI, CBDC-র সম্মিলিত শক্তি ভারতকে ডলার নির্ভরতার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে চলেছে।

প্রথমে বলি কেন এই মুক্তি প্রয়োজন?

ডলার আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হওয়ায়, সৌদি আরব তার তেল শ্রীলঙ্কাকে বেচলেও টাকার মূল্য ডলারের সাপেক্ষে কমছে। এর ফলে আমাদের দেশ বহু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আমদানি করা পণ্য ও পরিষেবার দাম বাড়ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য, কিছু জীবনদায়ী অষুধ, খনিজ তেল ও ভোজ্য তেল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাংক বা এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করতে আরও বেশি দেশি মুদ্রা খরচ করতে হয়।

তহলে রাস্তা কী?

এক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবেই ডলারের বদলে অন্য কোনো মুদ্রা বা সোনার ব্যবহার।

দুই, ভারতীয় মুদ্রায় অন্তত ভারতের রপ্তানি ও আমদানি চালিয়ে যাওয়া। প্রথমটি কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবে না। গ্যাট চুক্তির পর থেকে তারা সারা পৃথিবীতে ডলার রপ্তানি করে গেছে আর বিনে পয়সায় উপভোগ করেছে চীনের পণ্য এবং ভারতের পরিষেবা। তাই ভারতকে নিতে হচ্ছে দ্বিতীয় রাস্তাই।

কী সেই রাস্তা?

SWIFT-এর বিকল্প হিসেবেই ইউপিআই-কে তুলে ধরা এবং বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের চুক্তি করে ভারতীয় মুদ্রাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা। আর সেটাই শুরু করেছে আমাদের দেশ, যা আজ থেকে দশ বছর আগে ভাবাই যেত না। দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ, মধ্যে প্রাচ্যের ৩৫টি দেশ এই প্রক্রিয়ায় রাজি হয়েছে। এতে বিদেশ থেকে অন্যাবাসীদের টাকা পাঠাতে আর আমেরিকান ডলারে তাঁদের ব্যাংকে কমিশন দিতে হবে না। তৃতীয় কোনো দেশের থেকে তেল কিনতে হলে আর SWIFT নেটওয়ার্ক কোম্পানিকে আমাদের কমিশন গুনতে হবে না। বিনা কারণে আমাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন হবে না। বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-সহ বিভিন্ন ব্যাংককে বিনা কারণে বেশি EMI দিতে হবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো পৃথিবীর অর্থব্যবস্থায় ভারত নিজের ছাপ রাখতে সক্ষম হবে।

আট বছর আগে আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বজয়ের এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে। ১৯৬৯-তে ব্যাংক জাতীয়করণ হয় গরিব মানুষকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আনার কুমিরছানা দেখিয়ে। গত আট বছরে দেশের দরিদ্রতম মানুষের আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি দেশকে নিয়ে গেছে এক নতুন উচ্চতায়, যেখানে সারা পৃথিবীতে আর্থিক মন্দা থাকলেও আমাদের বৃদ্ধি হয় দুই অঙ্কে। সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি আমাদের সেই সব দেশের চেয়ে কম, যাদের মুদ্রাস্ফীতি গত ১০০ বছরে সম্ভবত একবারও আমাদের বেশি হয়নি। এই সবই মোদীনোমিক্সের ম্যাজিক।

মোদীনোমিক্স ৩-এ লিখবো কীভাবে কর ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কিং-সহ বিভিন্ন সংস্কার ভারতকে উৎপাদন শিল্পের গন্তব্য হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছে।

(লেখক ইঞ্জিনিয়ার তথা চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট)

বিবিসির প্ররোচনায় মোদী বিরোধীরা উল্লসিত

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

গুজরাটের গোধরাকাণ্ডের ২০ বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিবিসি একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছে। মোদী বিরোধী দলগুলির ছাত্রশাখা ফিল্মটিকে মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। গোধরাতে ৫৯ জন করসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার পর সারা গুজরাটে হিন্দুদের ক্ষোভ তীব্রতর হয়ে আছড়ে পড়ে তাতে বহু অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যায়। এর পরেই দেশবিরোধী শক্তি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কালিমালিপ্ত করার জন্য চারটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করে। নির্মাতারা হলেন পঙ্কজ শঙ্কর, গোপাল মেনন, ললিত ভার্চিন ও সৌমিত্র দস্তিদার। ফিল্মগুলি এই প্রতিবেদক মনোযোগের সঙ্গে দেখেছে। ফিল্মের প্রথমেই দেখানো হয়েছে গোধরা স্টেশনে একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। তারপর আবছা অন্ধকারে স্টেশনের একটু দূরে তিন-চারটি পোড়া বগি দাঁড়িয়ে আছে। এক-দুই মিনিট ওই পোড়া বগি কয়টি দেখানো হলো। তারপর পর্দায় ভেসে উঠল একের পর এক পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে যাওয়া সারি সারি করসেবকদের মৃতদেহ, আর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল 'আমার বোনের পেটে আটমাসের বাচ্চা আছে, ওকে ছেড়ে দাও', ' তলোয়ার দিয়ে তারা পেট চিরে আটমাসের বাচ্চাটাকে বার করে আধমরা বোনের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওরা' ইত্যাদি।

এই ৪টি ফিল্ম ভারতে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এবং বিদেশেও ব্যাপকভাবে দেখানো হয়েছিল। বিদেশি অর্থপুষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি প্রচার করে যে ২৯, ৩০, ৩১ ফেব্রুয়ারি তিনদিন মুসলমান নিধনের পর ১ মার্চ সেনা তলব করেন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী বিরোধিতায় ওরা ভুলে গিয়েছিল যে ফেব্রুারির শেষদিন ছিল ২৮ তারিখ। মোদী তিনদিন পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখেছিলেন, এটা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। ২৮ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত ও ১৬ জন আহত হয়। পরের দিন অর্থাৎ ১ মার্চ পুলিশের গুলিতে ২৪ জন হিন্দু নিহত ও ৪০ জন হিন্দু আহত হয়। সরকারি হিসাবমতো ওই দাঙ্গায় মোট ৮০ জন হিন্দু পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এবং ২০৭ জন হিন্দু আহত হয়। কিন্তু নির্লজ্জ সংবাদপত্রগুলি এই সংবাদ প্রকাশ করেনি। মুসলমানদের আক্রমণে ১ মার্চ থেকে প্রথম তিনদিনে উভয় পক্ষের ৬১১ জনের মৃত্যু হয় এবং তারমধ্যে পুলিশের গুলিতে ১০১ জনের মৃত্যু হয়। এই ১০১ জনের মধ্যে ৬১ জন হিন্দু ছিল আর ৪০ জন ছিল মুসলমান। ৫ মার্চ কমপক্ষে ৪০ হাজার হিন্দুকে ত্রাণশিবিরে পাঠাতে হয়েছিল। মুসলমানদের দুর্গতির কথা প্রচারিত হলেও হিন্দুদের দুর্গতির কথা কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে ইউপিএ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, গুজরাট দাঙ্গায় ৭৯০ জন মুসলমান এবং ২৫৪ জন হিন্দুর মৃত্যু ঘটে। ২৫০০ জন আহত ও ২২৩ জন নিখোঁজ। এতেই প্রমাণিত হয় যে গুজরাটে একতরফাভাবে শুধু মুসলমান নিধন হয়নি। এতেই তো প্রমাণিত হয় যে মোদী দাঙ্গা দমন করতে নিরপেক্ষভাবে পুলিশকে ভুমিকা পালন করেত নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে 'জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মাদানির একটি বিবৃতি তুলে ধরা যায় যা ২০১৩ সালের ২৮ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে মুসলমানদের পত্রিকা 'কলম'-এ। 'গুজরাট থেকে অনেক বেশি দাঙ্গা হয়েছে রাজস্থানে (কংগ্রেস শাসিত) ও উত্তরপ্রদেশে (সপা শাসিত)। মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের মুসলমানদের কথা তুলনা করলে বলতে হয়, গুজরাটে মুসলমানরা অনেক ভালো রয়েছেন।' সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুসারে মুসলমানদের সংখ্যা ৯.১ শতাংশ আর সরকারি চাকরিতে তাদের সংখ্যা ৫.৪ শতাংশ, যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সর্বোচ্চ।

মুসলমানদের পত্রিকা কলমের ২০১৩ সালে ২৫ জুনের একটি রিপোর্ট উল্লেখ করা যায়।' গোধরাকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু বিধবাদের পাশে দাঁড়াল মুসলমানরা। বড়োদরার সর্দারনগরে ৫৪ জন হিন্দু বিধবার হাতে আর্থিক স্যাহায্য তুলে দেন মুসলিম সংগঠন হামদরদ'। এতেও কি প্রমাণিত হয় না যে গোধরাকাণ্ডে একতরফাভাবে শুধু মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, হিন্দুরাও হয়েছিল।

সুতরাং নরেন্দ্র মোদী দাঙ্গায় উসকানি দিয়েছেন এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। আর সুপ্রিমকোর্ট নিযুক্ত সিটের তদন্তে তা প্রমাণিতও হয়নি। মোদীকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিভিন্ন এনজিও মিথ্যা বয়ান সাজিয়ে এবং মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করিয়ে দাঙ্গার বীভৎসতা প্রচার করেছে। ২০০৪ সালের নির্বাচনে সিপিএম তাদের প্রচারাভিযানে একটি ভিডিয়ো প্রচার করেছিল, তাতে কউসর নামে এক গর্ভবতী মহিলার পেট ত্রিশূল দিয়ে চিরে তার ভ্রূণটি ধ্বংস করছে হিন্দুরা। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট নিযুক্ত সিট জানিয়ে দেয়, ঘটনাটি মনগড়া এবং ভিডিয়োটি জাল।

তাসত্ত্বেও ভারতবিরোধী শক্তি ভারতকে কালিমালিপ্ত করা থেকে বিরত হয়নি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আবার সেই প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছে ভারতবিরোধী আন্তর্জাতিক চক্র। আর তাতেই ভারতের মোদীবিরোধীরা উল্লসিত হয়ে পড়েছে। □

গ্রামের মানুষ ওঝা হয়ে দিদির ভূত তাড়াতে ব্যস্ত

বিশ্বপ্রিয় দাস

নতুন কৌশল, নতুন গিমিক। মানুষকে ধোঁকা দেবার দিদির একটি নতুন পথ 'দিদির দূত'। সাধারন মানুষের কাছে নাকি সরাসরি পৌঁছবেন শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা। আর শুনবেন তাদের অভাব অভিযোগ। প্রতিকার কি হবে? তার নিদান দেবার ক্ষমতা এই জনপ্রতিনিধিদের যে নেই, সেটা রাজ্যের ভোটাররা হাড়ে হাড়ে ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন। আর তার প্রত্যুত্তর তারা দিচ্ছেন দিদির দূতের নামে যে জনপ্রতিনিধিরা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন , তাঁদের। বাস্তবে যে ছবি রাজ্যের শাসকদলের কাছে পৌঁছচ্ছে, সেটা যে স্বস্তিদায়ক নয়, তাও যে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না শাসক দলের, এমনটাই মত পোষণ করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। আবার কেউ মনে করছেন শাসকদল জল মাপার চেষ্টা করছে পঞ্চায়েত ভোটের আগে। আবার কেউ কেউ বলছেন, রাজ্যে শাসকদলের সমস্ত বিধায়কের ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চিহ্নমাত্র নেই। সঙ্গে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ। যার অধিকাংশই অনুন্নয়ন আর দুর্নীতিকেন্দ্রিক। এর মধ্যে আছে আবাসন থেকে শিক্ষা সব। একজন বিধায়ক যখন তার কেন্দ্রে দিদির দূত হয়ে হানা দিচ্ছেন, সেই সময় তাঁকে কাছে পেয়ে সাধারণ মানুষ উগরে দিচ্ছেন তাঁদের ক্ষোভ। ব্যঙ্গ করে কেউ কেউ

এটাকে বলছেন, দিদির দূতকে দেখে, দিদির ভূত ভাবছে গ্রামের মানুষ। তাই সেই ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা করছে তারা।

দিদির প্রিয়ভাই কেষ্ট এখন শ্রীঘরে। তাঁর জেলায় সিউড়ি এলাকায় বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী গিয়েছিলেন দিদির দূত হয়ে। তিনি নিজের পরিচয়ে নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জির পরিচয়ে গিয়েছিলেন। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে। দিদির দূত সবাই ওই পরিচয়েই যাচ্ছেন। গিয়ে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন পদে পদে। সিউড়ির বিধায়ক বিকাশবাবুকে ঘিরে গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামের শাসকদল তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে। কোচবিহারে তৃণমূল নেতা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে পড়তে হলো এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে। তাঁকে ঘিরে গ্রামবাসী প্রশ্ন করতে শুরু করেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী তথা দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও বীরভূমের দিদির ভাই কেষ্ট মানে অনুব্রতকে নিয়ে। গ্রামবাসী সরাসরি পার্থ ও অনুব্রতর দুর্নীতি নিয়ে কটাক্ষ করার পাশাপাশি চোর বলে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েনি। এলাকার অনুন্নয়ন নিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন আরেক নেতা পার্থপ্রতিম রায়। তুফানগঞ্জে গিয়ে খারাপ রাস্তা ও অনুন্নয়ন নিয়ে গ্রামবাসী ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। একই অবস্থা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক থেকে শতাব্দী রায়ের ক্ষেত্রেও। আবারও সেই বীরভূম। এখানে দিদির দূত হয়ে গিয়েছিলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। সিউড়ির ফুল্লাইপুর গ্রামের ঘটনা। গ্রামবাসী শতাব্দী রায়ের কনভয় আটকে দেয়। ঘিরে ধরে তাঁকে। অভিযোগ সেই অনুন্নয়ন নিয়ে। রাস্তা থেকে পানীয় জলের সমস্যা। যে সমস্যা গত এগারো বছরে এক ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে দাঁড় করিয়েছে হাজার হাজার গ্রামবাসীকে। বিক্ষোভের মুখে পড়ে কোনো রাস্তা দেখাতে পারেননি দিদির দূত।

বাঁকুড়া বা মুর্শিদাবাদেও একই চিত্র। বাঁকুড়ায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দুই বিধায়ক। তালড্যাংরার বিধায়ককে ঘিরে সেই অনুন্নয়নের কথা। রাস্তা আর পানীয় জলের

দিদির দূত কর্মসূচির মাধ্যমে একজন বিধায়কের জনসমর্থন মেপে নিতে চাইছেন। গ্রাম বা তৃণমূল স্তরে কতটা বেকায়দায় রয়েছে শাসকদল সেটাও ধরা পড়ে যাচ্ছে।

সমস্যা নিয়ে ঘেরাও বিধায়ককে।

কেন এই বিক্ষোভ? কেন এই উষ্মা? রাজনৈতিক মহলের মতে গত এগারো বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে রাজ্যে উন্নয়নের চিত্রটা একেবারেই তলানিতে। সেই তুলনায় বেড়েছে নানা সমস্যা আর দুর্নীতি। গোরুপাচার, কয়লাপাচার, শিক্ষা থেকে আবাসন দুর্নীতি। নেতাদের নানা কীর্তি মানুষের সামনে এসেছে। গ্রামের মানুষের কাছে বড়ো নেতা তো দূরের কথা, পঞ্চায়েত প্রধানও ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেখানে সাহায্য চাইতে গেলে মেলে হেনস্থা।

একটি ঘটনার কথা বলতেই হয়। সরকারি আবাসনের জন্য গ্রামের মানুষ আবেদন করেছিলেন। সবাই ছিলেন গৃহহীন মানুষ বা কুঁড়েঘরে থাকা মানুষ। স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি পাকা ঘরের। এক সময় তারা দেখলেন যাদের ঘর আছে তারাই পেল ঘর। কবি সেই কবে বলেছিলেন, 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি', আর বাস্তবতায় এখন একেবারে প্রমাণিত।

রাস্তায় বসে যোগ্য প্রার্থীরা শিক্ষকের চাকরি চাইছেন প্রায় দু'বছর ধরে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের চাকরি লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চুরি হয়ে গিয়েছে। জেলখানায় পুরে দিলেই কি ক্ষতিগ্রস্ত মুখগুলোতে হাসি ফোটানো সম্ভব? যদি দুর্নীতিবাজদের গরাদে পোরার পাশাপাশি এই যোগ্য প্রার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করা হতো তাহলে কি ভালো হতো না?

এগারো বছর ধরে চলা একটি সরকার রাজ্যকে প্রায় ১৫০ বছর পেছনে ফেলে দিল। একটিও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেনি এই সরকার। ফলে শিক্ষিত বেকারদের পাশাপাশি পেশাদার বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে দিন দিন। এই উত্তর কি এই সরকার দিতে পারবে?

রাজ্যের পিঠাপিঠি দুটি নির্বাচন। পঞ্চায়েত ও লোকসভা। মানুষের কাছে রাজ্যের শাসকদল এটাই প্রমাণ করতে চাইছে যে তারা কতটা চিন্তা করে রাজ্যের মানুষদের নিয়ে। বেশ কয়েকটি এরকম কর্মসূচি শাসকদল নিয়েছিল। যেমন দিদিকে বলো, মেয়রকে সরাসরি ফোন ইত্যাদি। তাও আবার পিসি-ভাইপো আলাদাভাবে। পেছনে লুকিয়ে অন্য উদ্দেশ্য। মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ক্ষোভের আগুনটাকে ঘুরপথে জেনে নেওয়া। সেইমতো গেমপ্ল্যান তৈরি করে ভাঁওতা দেবার ব্যবস্থা করা। মানুষ বিশ্বাস করে সেখানে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন আর অপেক্ষায় দিন গুনেছিলেন। আজও তার সুরাহা হয়নি। অন্যদিকে আরেকটি বিষয় শাসকদল জেনে নিতে চাইছে, তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন কতটা? এলাকায় তাদের ভিত কতটা শক্ত?

এরকম কর্মসূচি বারে বারে অসফল হওয়ায়, একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেজায় রুষ্ট। ওই সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, দিদির দূত কর্মসূচির মাধ্যমে একজন বিধায়কের জনসমর্থন কতটা, সেটাও মেপে নিতে চাইছেন। দলের বিধায়করাও নাকি বিষয়টি টের পেয়ে গিয়েছেন। এদিকে গ্রাম বা তৃণমূল স্তরে কতটা বেকায়দায় রয়েছে শাসকদল সেটাও ধরা পড়ে যাচ্ছে। তোলাবাজি থেকে দুর্নীতি দলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে, সেটাও মুখ্যমন্ত্রীর কপালে ভাঁজ ফেলেছে, জানা গেছে সূত্র মারফত। □

রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো পদযাত্রা

সংবাদে প্রকাশ চীন, জাপান, কোরিয়া, ব্রাজিল আমেরিকা, জার্মানি-সহ বিভিন্ন দেশে আবার নতুন করে কোভিড বা করোনা সংক্রমণ ঘটছে। সে কারণে ভারত সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তাই এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো পদযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে রাহুল গান্ধীকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর ভারত জোড়ো পদযাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে রাহুল গান্ধী উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন তাঁর 'ভারত জোড়ো' পদযাত্রা স্থগিত করতে কেন্দ্রের এটা একটা অভিসন্ধি। মনে রাখা প্রয়োজন, মরসুমে বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে থাকে। ২৫ ডিসেম্বর বা বড়োদিন, পয়লা জানুয়ারি বা ইংরেজি নববর্ষ তো আছেই, পশ্চিমবঙ্গেই সেই সঙ্গে পৌষ মেলা, মকর সংক্রান্তি বা সাগরমেলা যেখানে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে থাকে। আর থাকে বনভোজন বা পিকনিক, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণার্থীদের সমাবেশ। সব কিছু চিন্তা করে বলা যেতে পারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়া পদযাত্রা স্থগিত রাখার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা সঠিক পরামর্শ।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার,
চন্দননগর।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রমাণ করেছেন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব

স্বামী বিবেকানন্দ আজও প্রাতঃস্মরণীয়। তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে জানার জন্য তিন বছর পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন। দেখেছেন এখানকার মানুষ যতটা দরিদ্র, ততটাই সৎ চরিত্রের। বলেছেন, ভারত আমার গর্ব। তাঁর একটি বাণী, 'ছুতমার্গ একটি মানসিক ব্যাধি'। বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী নতুন ভারত গড়তে স্বামীজীর ওই বাণীটিকে প্রণিধানযোগ্য মনে করেছেন এবং তা বাস্তবায়নে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় রেখে চলেছেন।

হিন্দুধর্মে বেদ বলতে বোঝায় শ্রুতি। তেমনি ধর্মশাস্ত্র বলতে বোঝায় স্মৃতি। ধর্ম হলো 'সুপথ'। ধর্ম মানুষের পাশববৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতবর্ষের সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রধানত ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। দর্শন শাস্ত্রের চারটি শাখা। ১) জ্ঞানবিদ্যা। ইচ্ছা ও অনুভূতি জ্ঞানের প্রকৃতি। ২) অধিবিদ্যা। যে বিদ্যা বাহ্যিক সত্তাকে অতিক্রম করে জগৎ, জীবন ও সত্তার আলোচনা করে। বস্তুর আভাসিক রূপ ও সত্তার রূপ সাকার ও নিরাকার। ৩) তর্কবিদ্যা। ব্যবহারিক বিজ্ঞানচিন্তা, জ্ঞানের তত্ত্ব অভিন্ন এবং তর্কবিদ্যার দ্বারা নিরূপিত। ৪) নীতিবিদ্যা। যা অধিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, 'ধর্ম তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়'।

তবে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 'ছুতমার্গ একটি মানসিক ব্যাধি'— এটা ধর্মশাস্ত্রসম্মত। বেদের সার উপনিষদ। উপনিষদে বলা হয়েছে, ' সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। শ্রীমদ্ভগবত গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্ত অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোস্তিমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞামগম্যং হৃদি সর্বস্ব বিষ্ঠিতম্'।। অর্থাৎ তিনি সমস্ত জ্যোতির পরম জ্যোতি। তাঁকে সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়। তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। কাজেই ছুতমার্গ মানসিক ব্যাধিই। এটা শাস্ত্রে প্রমাণিত। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার কলম্বাস হলে উপস্থিত সকলকে 'ব্রাদারস অ্যান্ড সিস্টারস' বলে সম্বোধন করলে উপস্থিত সকলে উচ্ছ্বসিত আনন্দে করতালি দিয়ে তাঁকে সম্মান জানান। তিনি বলেন, 'মানুষে মানুষে সম দর্শন, অহিংসাই হিন্দু ধর্মের মূলকথা এবং শ্রেষ্ঠত্ব।'

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

এক মহামানবের নাম কবীর

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন অনেক মহামানব যাঁদের জন্মবৃত্তান্ত সঠিক ভাবে জানা যায়নি। এমনই ছিলেন লালন, কবীর ইত্যাদি। সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন কবীর। লেখক দীপক খাঁ খুব সুন্দর ভাবে মহামানব কবীর সম্বন্ধে লিখেছেন। কবীর ছিলেন এমনই একজন মহামানব যিনি জাতিভেদ মানতেন না। তিনি মনে করতেন সব ধর্মের মানুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাঁর কাছে হিন্দু, মুসলমানের কোনো বিভেদ ছিল না।

কবীরের জন্ম সঠিক কোন সময়ে কোথায় হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন তিনি মুসলমান ছিলেন। আবার কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে তিনি হিন্দু ছিলেন। কবীরের জীবনী তাই সঠিক ভাবে লিখিত হয়নি। কবীরের জীবনী কিছু কবীরপন্থী সাধুদের সৃষ্টি। তাঁর জীবনের বহু কাহিনি কিংবদন্তী বা মিথ। অনেকটা অলৌকিক জীবনের অধিকারী ছিলেন এই মহামানব।

তাঁর ছোটো ছোটো উপদেশ যা দোঁহা নামে অভিহিত তা এখনও মানুষের মনে গেঁথে আছে। কবীর লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু বেদ, কোরানের মূল উদ্দেশ্য কী— সেটা তিনি গল্পের ছলে সব ধর্মের লোকেদের বলতেন। কবীর দাস ছিলেন তখনকার দিনে বিখ্যাত সাধু রামানন্দের শিষ্য। এই গৃহস্থ সংসারী মহামানব কবীর ছিলেন পরোপকারী আধ্যাত্মিক ভাবোদ্যোতক সর্ব ধর্মের সমন্বিত এক যুগপ্রবর্তক মহামানব।

—**সঞ্জয় ব্যানার্জী,**
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

ফঃ ৩

আওয়ামি লিগ কখনো হিন্দুদের পক্ষে ছিল না এখনও নেই

স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের অবদান বাংলাদেশ শুধুই মুখে উচ্চারণ করে। আপেক্ষিক এ প্রীতিটা অনেকটাই সংকীর্ণ। যুদ্ধের সময়ে চীন সরকার পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল এমনকী অস্ত্র অর্থ দিয়ে সাহায্যও করেছিল কূটনৈতিক ভাবেও তারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এবং অপ্রিয় সত্য যে বাংলাদেশের চীনপ্রীতি এখন স্পষ্ট। সর্বশেষ উদাহরণ সম্প্রতি কর্ণফুলি টানেল উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু নির্লজ্জ সরকার তার বন্ধুদেশ ভারতকে উপেক্ষা করেছে।

বর্তমানে মোল্লাবাদের উত্থানে আওয়ামি লিগ যে পরোক্ষভাবে ইন্ধন দিয়ে চলেছে সেটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। শেখ হাসিনা সরকার সারা দেশের প্রতিটা উপজেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে মডেল মসজিদ তৈরি করেছে। কিন্তু একটা হিন্দু মন্দির কিংবা অন্য ধর্মের লোকেদের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান করে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে আছেন।

হিন্দু নিধন বাংলাদেশে এখন আর নতুন সংস্কৃতি নয়। বিষবৃক্ষের এ বীজ মহীরুহে পরিণত করেছিলেন তৎকালীন সামরিক সরকার প্রধান হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। সারা দেশের মানুষের চোখে কলুর বদলের মতো ঠুলি লাগিয়ে সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দিয়েছেন। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে ইসলামি বিশ্বের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। এতে মোল্লাবাদীরা উৎসাহিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্বজিৎ হত্যা এ সময়কালের হিন্দু নিধনের জ্বলন্ত উদাহরণ। একটু পেছনে ফিরে যদি তাকাই দেখা যাবে সারাটা দেশে হিন্দুদের ঐতিহাসিক অবদান ও ত্যাগের কোনো মূল্যায়ন কখনো হয়নি। বাংলা ভাষা আন্দোলনে প্রথম প্রতিবাদী লৌহমানব ব্যারিস্টার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে আজ স্মরণ করার কোনো তাগিদ জাতিটার নেই। এই মহান মানুষটিকেও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে সামরিক জন্তুরা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। হিন্দুদের স্থাপনা ও সম্পদ সম্পত্তি কুক্ষিগত করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং হিন্দুদের নিঃস্ব করার প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। যার ফলে লক্ষ লক্ষ বিত্তশালী হিন্দু সব হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়ে আছে এখনো। অনেকে জীবন বাজি রেখে প্রাণ বাঁচাতে খালি হাতে ভারতে পালিয়ে গেছেন। সম্পদ হারানোর কষ্টের ক্ষত অনেক হিন্দুদের অন্তরে এখনো প্রতিনিয়িত বিদ্যমান। অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে হয় হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করাই যেন বিরাট অপরাধ। আমরা অনেকেই মনে করি আওয়ামি লিগ হিন্দুদের পাশে আছে। সেটা যে একশো শতাংশ ভুল সেটি একটু উল্লেখ না করে পারছি না। দেশটি স্বাধীনতা লাভের পর স্বয়ং রাষ্ট্রনেতার ছেলে বিশেষ করে ঢাকার শাঁখারীপট্টির হিন্দু মেয়েদের বলপূর্বক ঘর থেকে টেনে এনে ধর্ষণ ও নির্যাতন করা নিয়মে পরিণত করেছিলেন। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত পাননি কিংবা পেত না। সেই চর্চা এখনো বহাল তবিয়তে বিদ্যমান।

বিগত পঞ্চাশ বছরে আওয়ামি লিগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি কেউ হিন্দুদের রক্ষা করার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। মুসলমান সংখ্যাধিক্য হওয়ার কারণে তাদের একটা বিরাট অংশ হিন্দু সম্পদ দখলকে ধর্মীয় অধিকারের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ফলে কখনো গনিমতের মাল কখনো শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করে সম্পদ লুণ্ঠনকে ধর্মীয় অধিকারে রূপান্তর করেছে। এ যেন তাদের একটা অধিকার।

এমনও হয়ে চলেছে যে একজন অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করতে পারলে বেহেস্ত নিশ্চিত হয়ে যায়। কোনো দলই হিন্দুদের উপর অবিরাম নির্যাতনের ব্যাপারে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখেনি। ফলে আজও কোনো রাজনৈতিক দল হিন্দুদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

—**সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী,**
আগরতলা, ত্রিপুরা।

ভুল তথ্য

১.৮.২০২২ তারিখের স্বস্তিকার বিশেষ প্রতিবেদনে (পৃ. ৩৫) বলা হয়েছে— 'সমগ্র পঞ্জাবকে যে কংগ্রেসদল পাকিস্তানের হাতে তুলে দিচ্ছিল সেই পঞ্জাবের কিয়দংশ পাকিস্তানের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ভারতে রেখেছিলেন বাঙ্গলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।' কথাটিতে উচ্ছ্বাস আছে, ইতিহাস নেই।

পঞ্জাবি হিন্দু-শিখরা পঞ্জাব ভাগের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল; এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৭-এর ৮ মার্চ সেই দাবি সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। গান্ধীজী সেই সময় বিহারে ব্যস্ত ছিলেন। সেখান থেকে তিনি, কার্যত কৈফিয়ত চেয়ে সর্দার প্যাটেলকে লিখেছিলেন : 'Try and explain to me your Pungab resolution if you can. I cannot understand it.' জবাবে প্যাটেল গান্ধীজীকে লিখেছিলেন, পঞ্জাব প্রস্তাব তাঁকে বোঝানো কঠিন। গভীরভাবে পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে ('It is difficalt to explain to you the resolution about the Punjab. It was adopted after the deepest deliberation. No thing had been done in a hurry or without full thought.' জওহরলাল নেহরুকেও গান্ধীজী অনুরূপ একটি পত্রাঘাত করেছিলেন। নেহরুর জবাব ছিল প্রস্তাবটির মূলে বাস্তব পরিস্থিতি; এবং জিন্নাহর দেশত্যাগের দাবির যোগ্য প্রত্যুত্তর ('the resolution in fact was based on reality; and it was the only answer to partition as demanded by Jinnah'--- 'The Indomitable Sardor', K.L. Panjabi.)

পঞ্জাব ভাগের ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কোনো ভূমিকা ছিল না।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

হাতে ‘সুবিধা’ মুখে হাসি

দিতি ভট্টাচার্য

পিরিয়ড বা মাসিক মেয়েদের জীবনে একটি প্রাকৃতিক ও শারীরবৃত্তীয় বিষয়। আর স্যানিটারি প্যাড হচ্ছে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজ অনেক এগোলেও এখনও মাসিক ঋতুস্রাবের বিষয়টিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে মেয়েদের বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বালিকা ও মহিলারা এখনও স্যানিটারি ন্যাপকিনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও বাজারে এ ধরনের ন্যাপকিনের মূল্য বেশি হওয়ায় তাঁরা কিনতেও পারেন না। গ্রামীণ ভারতের বহু মহিলাই পিরিয়ডের সময় কাপড় ব্যবহার করেন। তার প্রাথমিক কারণ, দামি স্যানিটারি ন্যাপকিন কেনার মতো সংস্থান তাঁদের নেই। এবং দ্বিতীয়ত, এখনও স্যানিটারি ন্যাপকিন ঘিরে অনেকেরই মনের মধ্যে থেকে গিয়েছে ধোঁয়াশা। এই সময়ে কাপড় বা অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর জিনিসের ব্যবহার মহিলাদের বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। এমনকী স্কুলছুট হয় বহু কিশোরী। একটি সমীক্ষায় গ্রামীণ ভারতের ২৩ শতাংশ কিশোরীর স্কুল ছাড়ার কারণ হিসেবে পিরিয়ডকেই দায়ী করা হয়েছে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের চতুর্থ দফায় দেখা গিয়েছে গ্রামীণ ভারতে আজও স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করেন মাত্র ৪৮.২ শতাংশ মহিলা।

২০১৫ সালে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে ৫০ শতাংশ মহিলা এই দেশে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে পারেন। তাই মহিলাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুরক্ষার কথা ভেবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে বাজার চলতি স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে না পারলে পাটের তৈরি স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে পারেন। সেই সময় পাট দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করার প্রস্তাবে জুট বোর্ডও অনুমোদন দেয়। কিন্তু পরে প্রস্তাব নিয়ে সাময়িক নানারকম টানাপোড়েন দেখা দেয়। শেষে ২০১৮ সাল থেকে শুরু হয় ‘সুবিধা’ ব্র্যান্ড। এই সময় জানানো হয় একটি স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করতে আড়াই টাকা খরচ পড়ে, কোনও রকম লাভ না রেখেই সেই টাকা দিয়ে বিক্রি করা হবে স্যানিটারি ন্যাপকিন। এরপর ২০১৯ সাল থেকেই স্যানিটারি ন্যাপকিনের দাম কমিয়ে ১ টাকা করা হয় মহিলাদের সুবিধার্থেই।

২০১৮ সাল থেকে কেন্দ্র সরকারের জন ঔষধি কেন্দ্রে স্বল্পমূল্যে ‘সুবিধা’ ব্র্যান্ডের স্যানিটারি ন্যাপকিন মিলত। যার দাম ছিল

ন্যাপকিন প্রতি আড়াই টাকা। ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে এই ন্যাপকিনের দাম কমিয়ে করা হয় ১ টাকা। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সামাজিক অভিযানের অঙ্গ হিসেবে দেশের ৬ হাজার ৩০০-র বেশি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র থেকে এই সাশ্রয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন পাওয়া যাচ্ছে। যার দাম মাত্র ১ টাকা। বাজারে এ ধরনের প্রতিটি প্যাডের মূল্য ৩-৮ টাকা।

জনঔষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এই উদ্যোগ ভারতের প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মহিলাদের স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য এবং সুবিধার বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুলভে সকলের জন্য গুণগতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তার অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় ফার্মাসিউটিক্যাল দপ্তর জনঔষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ন্যূনতম মূল্যে স্যানিটারি প্যাড বিক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সার ও রাসায়নিক মন্ত্রকের দুই প্রধান আধিকারিককে এই প্রকল্পকে নতুন করে গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জনঔষধি কেন্দ্রের নোডাল সংস্থা সার ও রাসায়নিক মন্ত্রকই। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের সচিব পি ডি বাঘেলা বলেছেন, ‘‘বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকেও কম দামে দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম ও শহরের এলাকাগুলিতে দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে একদম কম দামে স্যানিটারি ন্যাপকিন পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই প্যাড হবে পরিবেশ বান্ধব অক্সো বায়ো-ডিগ্রেডেবল। ব্যবহারের পরে পরিবেশ দূষণ ঘটাবে না এবং বাতাসে অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে সহজেই মাটিতে মিশে যাবে। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রগুলিতে ২০১৮-র ৪ জুন থেকে ২০২০-র ১০ জুন পর্যন্ত ৪ কোটি ৬১ লক্ষেরও বেশি স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রি হয়েছে। ২০১৯ সালের ২৭ আগস্ট মূল্য সংশোধনের পর জনঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ২০২০-র ১০ জুন পর্যন্ত ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ প্যাড বিক্রি হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ও জনঔষধি কেন্দ্রগুলি সাধারণ মানুষকে প্রশংসনীয় পরিষেবা দিয়েছে। ওষুধ থেকে শুরু করে অন্যান্য আবশ্যিক সামগ্রী তারা গ্রাহকের কাছে আজও পৌঁছে দিচ্ছে। গত মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে জনঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ১ কোটি ৪২ লক্ষেরও বেশি স্যানিটারি প্যাড বিক্রি হয়েছে। এমনকী প্রতিটি জনঔষধি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যানিটারি প্যাডের জোগানও রয়েছে। □

‘অঙ্গনা’ বিভাগের জন্য লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
বিষয় : নারী ক্ষমতায়ন, বর্তমান ভারতে নারী সমাজের অগ্রগতি, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মাতৃশক্তি, নারী শক্তির উত্তরণের কাহিনি, রত্নগর্ভা মা ইত্যাদি নারী জাগরণের যে কোনও দিক। যা ভারতীয় নারী সমাজের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে সক্ষম।
ওয়ার্ড ফাইল অথবা পিডিএফ পাঠাতে পারেন। হাতে লেখা কপি স্ক্যান করে পাঠাবেন।
যোগাযোগ ঃ স্বস্তিকা সম্পাদকীয় বিভাগ,
মোবাইল-৮৪২০২৪০৫৮৪

বিঃ দ্রঃ- অঙ্গনা বিভাগে শুধুমাত্র মহিলা লেখকদেরই লেখা প্রকাশিত হয়।

দুর্ঘটনা ঘটলে কী করবেন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

দুর্ঘটনা ঘটলে কী করণীয়। গ্রামে এখনও হাসপাতাল দূরে হওয়ার কারণে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সকলের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(১) **রক্তপাত :** অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হলে উৎস নির্ণয় অত্যন্ত জরুরি। যেমন ক্ষুদ্রান্ত্রের রক্ত হলে কালচে লাল হবে। পাকস্থলীর রক্ত হলে কফির রং হবে। মস্তিষ্কের রক্ত হলে নাক ও মুখ দিয়ে লাল রক্ত বেরিয়ে আসবে। ফুসফুস থেকে কাশি-সহ লাল ফেনাযুক্ত রক্ত হবে। কিডনি থেকে হলে প্রস্রাবে ব্যথা অনুভব ও মূত্র-সহ রক্ত নির্গত হবে।

এই সব ক্ষেত্রে রোগীকে কাত বা হেলান দিয়ে বসিয়ে উৎসমুখে ঠাণ্ডা জলের পটি বা বরফ চাপা দিতে হবে। নাকের রক্তক্ষরণে রোগীকে সোজা বসিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে দেওয়া উচিত। নাক বা কানে কখনই তুলো দেওয়া যাবে না। অনেক সময় হৃদপিণ্ডের রক্তবাহী শিরার অনিয়মে পায়ের দিকে শিরা স্ফীত হয়ে ফেটে রক্ত বের হয়, যা মৃত্যুর কারণও হয়। এক্ষেত্রে ক্ষরণের স্থানে পটি দিয়ে বেঁধে যতদূর সম্ভব তুলে ধরতে হবে।

সাধারণত কাটাছেঁড়ার ক্ষরণ স্থানে সরাসরি চাপ কিংবা প্রধান রক্তবাহী শিরার উপর ব্যান্ডেজ বা আঙুলের গোড়ার চাপেও রক্তপাত বন্ধ করা যায়। আবার শরীরের মধ্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে অথচ উৎস নির্ণয়ে অক্ষম, এসবের মানে হলো প্রচণ্ড জলপিপাসা, মাথা ঘোরা, বকবকানি, বাতাসের জন্য ব্যাকুলতা, তলপেটে ভার বোধ, চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, শীত শীত ভাব ইত্যাদি। এক্ষেত্রে দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত। সম্ভব হলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হ্যামামেলিস ৩০ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) **ভাঙা, কাটা ও থেঁতলে যাওয়া :** ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। কিংবা, হয়ে গেলেও তাকে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটি দিতে হবে। হাত, পা ভাঙার ক্ষেত্রে ভাঙা

অংশে বাঁশ বা কাঠের টুকরো দিয়ে বেঁধে অঙ্গটিকে স্থির করে দেওয়া ভালো। মাথার আঘাতে ব্যান্ডেজ করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দারুণ ফলপ্রসূ।

(৩) **শ্বাসরোধ :** নানা কারণে শ্বাসরোধ হতে পারে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পায়ে গরম জলের বোতলের সেঁক ও গায়ে গরম সেঁক দিয়ে রোগীর শরীরকে উষ্ণ রাখা। নাকে বা মুখে মুখ দিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে হবে ও পোশাক ঢিলে করে দিতে হবে।

(৪) **বিষপান :** খালি পেটে বিষ পান মারাত্মক ক্ষতিকর। অচৈতন্য রোগী ব্যতীত ১ লিটার গরম জলে ১০-১২ চামচ লবণ গুলিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বমি করানো যায়। বমি সহজে না হলে মধ্যমা আঙুল গলায় প্রবেশ করিয়ে বমি করাতে হবে। মাদকদ্রব্য সেবনে বিষক্রিয়া দেখা দিলে রোগীকে জাগানো নিষ্প্রয়োজন। কড়া কফি বা লেবুর রস পান করালে এবং ভিজা তোয়ালে রোগীর মুখমণ্ডল, গ্রীবা বা বক্ষের উপর চাপড়ালে উপকার হয়।

(৫) **জলে ডোবা :** সর্বাগ্রে গলা, মুখ, নাক পরিষ্কার করে সমতল জায়গায় উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। মাথার দিকটা আলতো ঢালু রেখে পেটের দু'পাশে এমনভাবে চাপ দিয়ে জল বের করতে হবে যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত না হয়।

(৬) **গলায় দড়ি দেওয়া :** লোক ডেকে রোগীকে মুক্ত করতে হবে। উপুড় করে পায়ের দিক উঁচু ও ঘাড় মাথা সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে শোয়াতে হবে। পিঠের দুটি পাখার মাঝে জোর করে টোকা মারতে হবে। দাঁতপাটি খুলে হাঁ করে দিতে হবে।

(৭) **সাপে কাটা :** বন্ধনী না দেওয়া পর্যন্ত রোগীকে নাড়াচাড়া না করা, আহত স্থানে নতুন ব্লেড নিয়ে গভীর করে কেটে দিতে হবে। তবে সাবধান ধমনী যেন না কাটে। পটসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা কার্বলিক বার সাবান দিয়ে অল্প গরম জলে ধুয়ে দিতে হবে। রোগীকে পর্যাপ্ত সান্ত্বনা দিয়ে, জাগ্রত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাতে হবে। কোন জাতের সাপ চিনতে পারলে ভালো হয়। বন্ধনী দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রক্ত চলাচলে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত না ঘটে।

(৮) **পোড়া :** দগ্ধস্থান হতে বস্ত্রাদি সাবধানে মুক্ত করে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে দগ্ধস্থান ডুবিয়ে রাখতে হবে। পরে আলুবাটা বা বার্নল আলতো করে লাগিয়ে চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে। দগ্ধ স্থানে রোদ ও হাওয়া লাগানো ক্ষতিকর।

(৯) **কুকুর কামড়ানো :** ক্ষতস্থানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে গরম জলে ধুয়ে দিতে হবে। কুকুরটিকে মেরে ফেলা যাবে না। ১০ দিন লক্ষ্য রাখতে হবে কামড়ানোর পরে কুকুরটির মধ্যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে কিনা।

(১০) **খিল ধরা :** পাতলা পায়খানা, বমি, খুব শীত ভাব, খেলাধুলা ইত্যাদি নানা কারণে খিল ধরলে আহত স্থানে পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা কমপ্রেস দেওয়া জরুরি। পায়খানার কারণে খিল ধরলে ২ গ্লাস জলে আধ চামচ লবণ মিশিয়ে পান করালে ভালো। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দারুণ ফলপ্রসূ।

(১১) **অজ্ঞান হলে :** মাথা কিছুটা নীচের দিকে নামিয়ে হাঁটু থেকে পা মুড়িয়ে নিতে হবে। স্মেলিং সল্ট শোঁকানো এবং মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা জরুরি। হোমিওপ্যাথিক ও এ্যামিল নাইট্রেট শোঁকানো যেতে পারে। ▫

দূতের হেনস্থায় ঝাপসা হচ্ছে বাঙ্গলার মেয়ের মুখ

ভবানী শঙ্কর বাগচী

বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম লায়েকবাঁধ। গ্রামের একচিলতে চায়ের দোকানে জটলা। ধুলো ওঠা পথের দু'ধারের আগাছা তুলছে মণি, হাদাম, টুসু। আজ চারদিকে তুমুল ব্যস্ততা। সকাল গড়ালেই শহর উজিয়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে এসে পড়বেন 'দিদির দূত', লোকাল বিধায়ক। গতকালই পার্টির ছেলেরা এসে পই পই করে পাখি পড়ার মতো করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, কী বলতে হবে। সঙ্গে নাকি খবরের কাগজের লোকেরাও থাকবে। রাস্তার দু'পাশের খানাখন্দে ঝপাঝপ মাটি পড়ছে। চারদিক সাফসুতরো। দূরে পার্টি অফিসের চালে বাঁধা মাইক থেকে ভেসে আসছে গান—

বাঁচার মতো বাঁচছে সবাই, থাকছে ভালো রোজ।

সবার কাছেই আছে দিদির, সুরক্ষা কবচ।

দিন আনা দিন খাওয়া লক্ষ্মীরানি, পালমণিরা ওসব সুরক্ষা কবচ- টবচ বোঝে না। গতবারের ভোটে নেতারা ভোট চাইতে এসে বলেছিল এবার ভোটটা দিলেই মাটির বাড়িটা পাকা হয়ে যাবে। কিন্তু বিধানসভা ভোট গিয়ে পঞ্চায়েত ভোট আসতে চলল এখনও সেসবের কোনও বালাই নেই। অথচ পঞ্চায়েত সদস্যদের বাড়ি একতলা থেকে দোতলা হয়ে গেল। রাস্তাটাও সেই কাঁকুড়ে মোরাম হয়ে রয়েছে এখনও। বর্ষাকালে ডুবে গিয়ে মরণফাঁদ হয়ে ওঠে। অথচ 'মেম্বার'দের কোনও হেলদোল নেই। লক্ষ্মীরানিরা ভেবেছে, এবার গাঁয়ের সবাই একজোট হয়ে দিদির দূতদের সব জানাবে। সে পার্টির লোকেরা যা বলে বলুক। মুখ না খুললে নিজের সমস্যার সমাধান কেউ করবে না।

> **“মানুষ এখন শাসক দলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস পাচ্ছে। প্রশ্ন করছে। লজিক বলে এটাই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া।”**

পঞ্চায়েত ভোট এসে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণে গ্রাম-গ্রামান্তরে এখন 'দিদির দূত'দের আনাগোনা। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেভাগেই স্থির করেছিল বাঙ্গালির একেবারে দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। তাই তৃণমূল সুপ্রিমো তথা স্ট্যান্ডিং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের সূচনা করেন। সঙ্গে ছিল 'দিদিকে বলো'। অনেক ভেবেচিন্তে এই জনসংযোগ প্রকল্পের প্লট সাজিয়েছিলেন টিএমসি'র ভোট পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোর। এই জনসংযোগের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূলের বিরুদ্ধে অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, তার জল মাপা। দুই, স্থানীয় ভাবে বিরোধী মনোভাবাপন্ন ভোটারদের চিহ্নিত করা। প্রথম সমস্যার সমাধান হয়েছিল দ্রুতগতিতে। রাজ্যের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ফি মাসে তৃণমূল সরকার জমা করেছিল ৫০০ টাকা করে। আর দ্বিতীয় সমাধানের প্রতিফলন ছিল ভোট পরবর্তী হিংসা ও সন্ত্রাস।

এরাজ্যের বিরোধীরা জানে, মমতা সরকারকে একটা চালেই মাত দেওয়া যায়। তা হলো দুর্নীতি। তৃণমূল কংগ্রেস যতই পুরনো খোলস ছেড়ে নতুন খোলস পড়ুক, দলটার দুর্নীতির ব্যারাম কোনও দিন যাবে না। কারণ

মাথাটাই তো ঘোটালার কারখানা। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকতে নিত্যনতুন ফন্দিফিকিরের আমদানি। ক্ষমতায় বসেই সারদা কেলেঙ্কারি, ২০১৬-তে নারদ কেলেঙ্কারি। আর একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কয়লা, পাথর, গোরুপাচার, কাটমানি-সহ একাধিক কেলেঙ্কারিতে মুখ পোড়ানো তৃণমূল কংগ্রেস বারবার কিন্তু জাল কেটে বেরিয়ে এসেছে। সরকার তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, জেলফেরত নেতারা মন্ত্রীও হয়েছেন।

এবারেও সেই একই পুনরাবৃত্তি। তৃতীয়বার ক্ষমতা দখলের পরই একাধিক স্ক্যাম তাড়া করে বেড়াচ্ছে 'দিদি'কে। তাঁর ভাইপো অসহায়ভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে ইডি, সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে। এসব থেকে বাঁচতে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা খরচ করে কখনো সুপ্রিম কোর্ট, তো কখনো হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়ছেন। শিক্ষা কেলেঙ্কারিতে জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের 'হোমরাচোমরা'রা। ইডি-সিবিআই এখনও তদন্ত করে চলেছেন। অভিযুক্তদের ডেরায় হানা দিলেই নগদ কোটি কোটি টাকার পাহাড়, সোনা-হিরের গয়নার স্তূপ মিলছে। সেই ছবি আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে গৃহস্থের বাড়িতে। যা রাজ্যের ছাপোষা মানুষগুলোর কাছে অনেকটা জিৎ, প্রসেনজিৎ অথবা দেব-এর ছবির গল্পের মতো হলেও একটা চরম বাস্তব। তারপর আবাস যোজনা, মিড ডে মিল-সহ একের পর এক দুর্নীতি। দিল্লির তদন্তকারীরা বীরভূমের বিশ্বস্ত 'নিধিরাম সর্দার'টিকে বমাল ধরে জেলে চালান দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ছত্রখান শাসকদল। দুর্নীতির পাঁকে ক্রমশ ডুবছে 'দিদির তরী'। অথচ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। চ্যানেলের ডিবেটে বসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা সেমিফাইনাল। কেননা ২০১১ সালে ক্ষমতায় বসার আগে প্রথমে পঞ্চায়েত, তারপর লোকসভায় বামেদের কোমর ভেঙে ধরাশায়ী করেছিলেন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ঘুরেফিরে সেই '১১ সালের জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে শুধু দুটো অঙ্কের।

সেদিনের বামেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস আর মমতার জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে বিজেপি। সবকিছু ঠিকঠাক চললে পরিবর্তনের পরিবর্তন দেখতে আর মাত্র তিনটে বছরের অপেক্ষা।

রাজনীতির চেয়ে কূটনীতি ও ছলাকলায় বেশি দক্ষ মমতা। মুখে যা আসে তাই বলেন। সাজিয়ে, গুছিয়ে কথা বলাটা কোনও দিন তাঁর ধাতে ছিল না। ভুল বলেন। উলটো পালটা বলেন। নিন্দুকদের মতে এটাই তৃমমূল সুপ্রিমোর ইউএসপি। নারদ কাণ্ডের পর প্রকাশ্য সভায় তাঁর বলা 'ভুল হলে শাস্তি দিন, চোর বলবেন না। খুব গায়ে লাগে। আমি আপনাদের ঘরের মেয়ে' কথাগুলো রাজ্যের মানুষের আবেগাকুল মনে দাগ কেটেছিল। বিরোধীদের আক্রমণ প্রসঙ্গে তাঁর কান্না ভেজা ডায়লগ ছিল, ''সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি বলেই ওরা আমায় পদে পদে হেনস্থা করে। আমি গরিব ঘরের মেয়ে। কিন্তু আমার এই অপমানের জবাব আপনারা দিন।'' অথবা ২০১৬ নির্বাচনী সভায় দুর্গাপুরে তিনি যখন বলেছিলেন '২৯৪টা সিটেই আমি আছি। আপনারা আমাকে দেখে ভোট দিন'-সেটাতেও মন গলেছিল ভোটারদের। দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছিল। তার ওপর রিগিং, ছাপ্পা, বুথজ্যাম তো ছিলই। কিন্তু ওই যে কথায় আছে, 'চোরা না শোনে ধর্মের বাণী'। দুর্নীতি করবে, জনগণের হকের টাকা মেরে হুমকি দেবে, একমুখে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী বিলিয়ে মেয়েদের সুরক্ষার কথা বলবেন,আবার আরেক মুখে ধর্ষকদের আড়াল করে বলবেন 'শরীর থাকলে যেমন অসুখ হয়, তেমনি ভিড়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটবে''।

রাজ্যের মানুষ কাঁহাতক নিতে পারে। স্কাই ইজ দ্য লিমিট। গোবেলসীয় থিয়োরিরও একটা লিমিট আছে। এবার আর কথায় কথায় রাজ্যের মানুষের আবেগ নিয়ে খেলাটা ঠিক জমছে না। সবদিক ভেবে চিন্তে তাই 'দিদির সুরক্ষা কবচ' নামে নতুন খেলার অবতরণা। তৃণমূলের সাড়ে তিন লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক 'দিদির দূত' হয়ে রাজ্যের পাড়াগাঁয়ে হাজিরা দিচ্ছে। বিধায়ক, সাংসদ, নেতা মিলিয়ে আরও ৩০০ জন নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই সব পরিদর্শনে। তাদের কাজটা কী? মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনা। মোদ্দা কথা জনসংযোগ সারা। একটা জনমত আঁচ করা, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কতটা খেপেছে। সেই মতো লাগসই দাওয়াই বাছা হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তৃণমূলমুখী করতে।

ঠিক সেই আশায় তুমুল ঢক্কানিনাদে শুরু হয়েছে 'দিদির সুরক্ষা কবচ'। জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক জিৎ গাঙ্গুলি এই প্রকল্পের একটা সিগনেচার গানও তৈরি করেছেন। সেই গানই দিদির ছোট বড়ো দূতেরা নগরে প্রান্তরে এন্তার বাজিয়ে চলেছে। তবে 'দিদির সুরক্ষা কবচের' শুরুটা আশানুরূপ হয়নি। প্রথমদিন থেকেই জায়গায় জায়গায় দিদির দূতদের দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া,ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে শুরু করে মালদা, মুর্শিদাবাদ ইস্তক মানুষ দিদির দূতদের ঘিরে ধরে নানারকম অভিযোগের ফিরিস্তি উজাড় করে দিচ্ছেন। ইটাহারের জনৈক গৃহবধূ এক সাংবাদিককে পেয়ে বলেই ফেলেন, '' চারদিকে নাকি উন্নয়ন আর উন্নয়ন। তা এতই যদি উন্নয়ন হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ ভুরি ভুরি অভিযোগ জানাচ্ছে কেন?'' বীরভূমের তারকা সাংসদ শতাব্দী রায় নিজের নির্বাচনী এলাকায় যাচ্ছিলেন দিদির দূত হয়ে মানুষের চাওয়া-পাওয়া শুনতে। মাঝপথে তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে সাধারণ মানুষ। ফুল্লাইপুর গ্রামে শতাব্দী রায়ের গাড়ি আটকে স্থানীয় মানুষ পানীয় জল, আবাস যোজনার ঘর, চাষের জল নিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে সেখান থেকে কোনও মতে বেরিয়ে আসেন বীরভূমের সাংসদ। এই সাংসদই ভোটের প্রচারে বেরিয়ে একবার এক গ্রামে বলেছিলেন, ''আপনারা সবাই এখানে আমায় দেখছেন বিনে পয়সায়। সিনেমা হলে আমায় দেখতে তো টাকা দিতে হয়। আপনারা যদি এভাবেই আমাকে ফ্রি'তে দেখতে চান তো আমায় ভোট দিতে হবে।'' আজ সেই শতাব্দী রায়ের এমন অবস্থা যে নিজের এলাকা থেকেই পালিয়ে বাঁচতে হচ্ছে।

সাংসদ মালা রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার থেকে শুরু করে বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী, জীবনকৃষ্ণ সাহা, নীহাররঞ্জন ঘোষ, উষারানি

মণ্ডল —যারাই দিদির দূত হয়ে মানুষের ‘দুয়ারে’ যাচ্ছেন, নাকের বদলে নরুন নিয়ে ফিরতে হচ্ছে। টেট, এসএসসি’র চাকরি, আবাস যোজনায় কাটমানি, জবকার্ডে কাটমানি, মিড-ডে মিলে কারচুপি নিয়ে হাজারো ক্ষোভে ভরা প্রশ্ন উজাড় করে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এমন অবস্থা যে উলটে দিদির দূতদেরই সুরক্ষা কবচ দেবার জোগাড়। ভরা মাঘের হালকা শীত যাব যাব করেও যাচ্ছে না। উলটো হাওয়া বইছে। এ তো যবনিকা পতনের অশনি সংকেত। মালদার পাঁসিপাড়া গ্রাম আরও একধাপ এগিয়ে পাড়ায় ‘দিদির দূত’দের ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি পঞ্চায়েতের ওই গ্রামে বাসিন্দারা বাড়ির দেওয়ালেই লিখে রেখেছেন ‘নেতা-মন্ত্রীর এই পাড়ায় ঢোকা নিষেধ’। বাসিন্দাদের ক্ষোভ গ্রামের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অযোগ্য। স্থানীয় পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এমনকী বিধায়ককে চিঠিচাপাটি করেও সুরাহা মেলেনি। বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা গেছিলেন দিদির দূত হয়ে। প্রথমে তাঁকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। বিধায়কের কাকুতি-মিনতির পর গ্রামবাসীরা বলেন,‘ভোট এসেছে, তা-ই এসেছেন। অন্য সময় আমাদের ক্ষোভের কথা তো কানেই তোলেন না।’’ ২০১১-য় ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে এযাবৎ এই ধরনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়নি। এমনকী চিটফান্ড কেলেঙ্কারি বা নারদ কেলেঙ্কারিতেও এত ঝক্কি পোওয়াতে হয়নি। যতটা দিদির দূত হয়ে সহ্য করতে হচ্ছে।

মানুষের এই স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিরোধের মুখে দিশেহারা তৃণমূল অবশ্য বলছে এতে দোষের কিছু নেই। সাফাই গাইছেন পার্টির সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি। বলছেন, ‘‘এই নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কিছু নেই। মানুষের অভিযোগ আর ক্ষোভ আমাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। মানুষ আমাদের কাছে কাজের আশা করে। তাই আমাদের বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। ভাইপোর সুরেই সুর মিলিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তবে এই আপ্তবাক্যে চিঁড়ে কতখানি ভিজবে সেটাই দেখার। বনগাঁর চৌবেড়িয়া-২ পঞ্চায়েতে দিদির দূত হয়ে গিয়েছিলেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। ওই এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি আবার বিজেপির। বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে দেখে স্থানীয়রা রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে অভিযোগ করেন। জবাবে কাকলি বলেন, আমাকে ভোট দেননি তাই এই অবস্থা। আগে ভোট দিন তারপর সব হবে। এই কথা শুনে খেপে ওঠেন স্থানীয়রা। জনৈক মহিলা বলেন, আমরা এবারও বিজেপি-কেই ভোট দেব। দেখি কীভাবে তৃণমূল পঞ্চায়েতে দাঁড় করায়।’’ মানুষ শাসকদলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস পাচ্ছে। প্রশ্ন করছে। লজিক বলে এটাই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া। পরিস্থিতি যে ধীরে ধীরে হাতের বাইরে যাচ্ছে, তা যথার্থই টের পাচ্ছে তৃণমূলের বড়ো-মেজো-ছোট নেতারা। শোনা যাচ্ছে অনেক সিনিয়র নেতাই নাকি দিদির দূত হতে চরম অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থায় দিদির হাতে কোনও সেন্টিমেন্টাল তুরুপের তাস কি এখনও বাকি আছে? রাজ্য জুড়ে মানুষের এই ক্ষোভ পঞ্চায়েতের ব্যালট বাক্সে কি আছড়ে পড়বে, নাকি ২০২৬-এও জিৎ গাঙ্গুলি গিটার হাতে গাইবেন-

এক জীবনে সমস্ত দিক, একটা সুতোয় জোড়া

দিদির হাতের ছোঁয়ায় আমার, বাংলা সোনায় মোড়া! ■

দিদির দূতেরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের মেশিনারি

দিদির দূত একটা পঞ্চায়েত টোটকা এবং রাজনৈতিক নাটক।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

সেই কতকাল আগে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র আপামর বাঙ্গালিকে দেখিয়েছিলেন কেমন করে নিন্দার ছলে প্রশংসা করতে হয়। অন্নপূর্ণা আর ঈশ্বরী পাটনীর ব্যজস্তুতিতে অলংকৃত সংলাপ আজকেও বেঁচে আছে। সাহিত্য লেখায় সৃষ্টিতে বেঁচে থাকুক, তা কাম্য। কিন্তু তা যদি একটু আধটু ধরন উপস্থাপন এদিক ওদিক বদল করে রাজনৈতিক নকশায় থেকে যায় তখন তো তা রাজনৈতিক জিলিপি। মাথায় জিলিপি বুদ্ধি জাগিয়ে তবেই ভাবতে হবে 'দিদির দূত' এবং তার দূতেদের সঙ্গে এলোপাথাড়ি বিভিন্ন জায়গায় মানুষের, সাধারণ খেটে খাওয়া বাঙ্গালির অভিযোগ এবং তার প্রায়োগিক গুরুত্ব। কোথায় ক'টা মানুষ একজোট হয়ে দিদির দূতেদের দিকে কটমট করে তাকাল বা তাদের এক আধ ঘণ্টা অবরোধ করল— এ সবকিছুই বেশ ফলাও করে খবরে এল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকতার ওপর যে ডাজ অ্যান্ড ডোন্ট বলেছিলেন তাতে তো এমন হওয়ার কথাই নয়। স্বয়ং মাননীয়াই বলেছিলেন সব সময় পজিটিভ নিউজ করতে। তবে? খুচরো খুচরো নেগেটিভ নিউজ আসছে যে বড়ো! রাজ্যে যখন টেট থেকে এসএসসি দুর্নীতির নিত্যনতুন সব ধরন দেখা যাচ্ছে। চাল থেকে ডিম, ডিএ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়োগ, ডবল ডবল চাকরি হবে বলার পরেও যখন রোজ তিন ডবল দুর্নীতি তথ্য প্রকাশ্যে আসছে— এ যে হাটে হাঁড়ি ভাঙা চলছে। এসব তদন্ত চলছে আইনি দাওয়াইতে। খবর তো প্রকাশ পাবেই। রাজ্য পুলিশ হলে ভুজুং দেওয়ার পথ ছিল। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। দিদির মাথায় এল নতুন সমীকরণ, রাজ্যে যে শাসক-বিরোধিতার ক্ষেত্র জীবিত, সমালোচনার গণতান্ত্রিক ময়দান যে এখনও খোলা এবং গঠনমূলক সমালোচনাও যে তৃণমূল চায় তার একটা লোক দেখানো কৌশল হলো দিদির দূত। এ হলো রাজনৈতিক ব্যজস্তুতি— যার আধুনিক নাম নেগেটিভ পাবলিসিটি। আসলে কোনো পাবলিসিটিই নেগেটিভ হয় না, নেগেটিভ দেখায়, শোনায়। কাজের কাজটা পজিটিভ হোক এটাই সব নেগেটিভ পাবলিসিটির লক্ষ্য। তৃণমূলের দুর্নীতি ভূতের ঝাড়ফুঁক ওঝা হলো দিদির দূত। ভঙ্গিখানা এমন যেন— দূতেরাই যাবে। অভিযোগ করার অবাধ স্বাধীনতা। তবেই না সর্ষের মধ্যে ভূত বাছা যাবে। লোক দেখানো স্বচ্ছতার ক্যাম্পেইন করছে দিদির দূত। যাদের ভণিতা এমন, যেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করছেই না, সবটাই গঠনমূলক সামাজিক দায়িত্ব। হায় রে, বিড়াল বলে মাছ খাব না যাবো গয়া কাশী!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভবত মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ডেল কার্নেগির আত্মোন্নতির পাঠ পছন্দ যা দীর্ঘ সময় বিশ্বের সর্বোচ্চ বিক্রিত বই ছিল। আত্মোন্নতির পথ কি এতো সহজ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০১৫-তে নিজেরই ভাষণ ছিল 'যারা কাজ করতে পারে না... তারাই নেগেটিভ পাবলিসিটি করে'— হাসতে হাসতে এটাই বলার দিদির দূতের কারণ কিছুটাতো বুঝলাম আমরা। এবং মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল 'যখন সব সেট হয়ে গেছে, তখন আর আপসেট হয়ো না'— দিদির দূত যেন ঠিক তেমনই এক সেটিং যাতে সাপ কিছুটা যদি মরে মরুক কিন্তু লাঠি ভাঙার

সম্ভাবনা নেই। একটা শাসক দলের ষোলো আনাই যদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, চুরি, আর দুর্নীতিতে ভরপুর থাকে তবে তা নাটকের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে না। তাই পনেরো আনা ওগুলো থাক, এক আনা ভণ্ডামির গণতন্ত্র, অভিযোগ বাক্স যা দিদির দূত নামে ঘুরছে। যত ঘুরছে তত বেশি তৃণমূল প্রচার করছে, কে বলতে পারে চোখ রাঙানি পঞ্চায়েতের আগাম ধমক চমকও দূতেদের গোপন ঝুলিতে আছে কিনা। মেইন স্ট্রিম পলিটিক্যাল ডায়ালগ থেকে তৃণমূলের মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল প্রায়ই সরে আসে, আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা করে তারা। বিকল্প কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম তৃণমূলের হাতে নেই, ওরা ইতিপূর্বেও দিদিকে বলো, বাংলা তার নিজের মেয়েকেই চায় ইত্যাদি অভিযোগ বাক্স সাজানো কৌশল সামনে রেখেছিল। দুয়ারে সরকারে যেমন তৃণমূল ক্যাডারের ভঙ্গিতে অনেকটা জনসংযোগ করল তখন ঠিক সময়ে ঠিক টোটকা দূত। কেউ যেন বলতে না পারে মিডিয়া এমনভাবে ক্যামেরা লাইট অ্যাকশান বলুক এবং দিদির দূত আসুক, মুখ ব্যাজার মানুষের অভিযোগ শুনুক। নিঃসন্দেহে বড়ো প্রচার এবং শাসক দলের সক্রিয়তা জাহির করার অভিনয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ঘাত অনুপ্রাণিত ব্রাজিলের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লুইজ লুলা ডি সালভাতে। সারা ব্রাজিলের কী অসংখ্য অভিযোগ তাকে নিয়ে। এই করেনি আর সেই করেনি। দুর্নীতির অসংখ্য অভিযোগ দেশটাকে পঙ্গু করে দিচ্ছিল। কিন্তু এতো নেগেটিভ প্রচার যা সবাইকে লুলা লুলা বলতে বাধ্য করল। মনস্তাত্ত্বিক খেলায় লুলা নির্বাচিত। জনতার অভিযোগের যে খেলা তৃণমূল ফোকাস করছে তা যেন ভোটারদের অভিমান। দিদির দূত যাবে এবং নিরাময় করবে। অন্তত দেখছি দেখব বলে চেষ্টা করার ভান করবে।

নেগেটিভ ক্যাম্পেইন বিষয়ে 'negative campaign, emotion and political participation' শীর্ষক গবেষণাপত্র যা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রকাশ করেছিল, তাতে উল্লেখ করছে ক্যাম্পেইন সব সময়ই সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বিশেষ করে স্ব-সমীক্ষার ক্যাম্পেইন, যা আগবাড়িয়ে বলে— আমাদের এইগুলো মন্দ এবং এর থেকে উন্নত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল দেওয়া আমাদের অঙ্গীকার। অর্থাৎ অন্য কাউকে কাদা ছোঁটানোর সুযোগটাই দেবে না। ১৯৯৮-তে গবেষক ফিনকেল এবং গিয়ার বলেছেন Negetive ads tend to actually mobilize— তৃণমূলের দিদির দূত ঠিক সেই কাজটাই খুব বুদ্ধিমানের সঙ্গে করছে। দিদির দূত আসলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্যাম্পেইন যা আত্মবিশ্লেষণের কায়দায় হাজির। যা গ্রামেগঞ্জে মানুষের আস্থা কুড়ানোর মেশিনারি। একটা আপাত মুক্ত সময় দেওয়া হচ্ছে তৃণমূল সমর্থকদের দিদির কাছে মন্দ লাগার বারোমাস্যা তুলে ধরার। আমেরিকাতেও অনেকবারই রাজনৈতিক দল তার নেগেটিভ ক্যাম্পেইন করেছে এবং জয়ী হয়েছে (Ansolabehere and Lyegngar 1997)। ব্রিটিশরাও এই কৌশলে হেঁটেছে (Heerda, 2007, Plasser and Plasser 2002) এবং টার্ন আউটে বহু ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির ছবি পাওয়া গিয়েছিল। তাই দিদির দূত খুব যে নতুন কৌশল তা নয়, পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজে সেরা হওয়া বাঙ্গালিরা হয়তো ভাবছেন দিদির দূতেরা কত ধৈর্য এবং

মানুষের মনে আক্ষেপ আতঙ্ক বিভ্রান্তি যে পাহাড় প্রমাণ তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই দিদির দূত যেই না যাবে অমনি হই হই করে মানুষ অসুবিধার ফিরিস্তি দেবে এবং দূতেরা দু' হাত তুলে সব সঙ্কটমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মনস্তাত্ত্বিক ভোটব্যাংক দখল করে আবার নিকটবর্তী ক্লাবে মোচ্ছব সেরে কালীঘাট ফিরবে।

অভিযোগ শোনার অবকাশ দিচ্ছে। যা তাদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবে অনেকটা তৃণমূল মুখী করছে। পঞ্চায়েতের প্রাক্কালে তৃণমূল যে একটা ফন্দি এঁটেছে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় যাকে বলে Figure ground hypothesis— যা বলছে The most widely accepted explanation for the negativity effects in the political domain. আমরা মনস্তাত্ত্বিক ভাবে সবাই ভালো শুনতে অভ্যস্ত এবং খুশিও। কিন্তু এই বাঁধাধরা নিয়ম থেকে বেরিয়ে যদি খারাপ বলার সুযোগ সাহস ও সময় কেউ আমাদের যেচে পরে দেয় তখন সেই আপাত ব্যতিক্রমী আচরণে আমরা বিশ্বাস রাখি।

দিদির দূত ঠিক সেই কাজটাই বেশ দায়িত্ব নিয়ে করছে। জনতা জনার্দন মনে করছে তারা গণতন্ত্রের শক্তি তাই তারা দিদির দূতের কাছে যা যা অভিযোগ দায়ের করছে তা গণতন্ত্রের জয়। এ যে আদতে স্বৈরতন্ত্রেরই ভিন্ন রূপ তা অনেকেই তলিয়ে দেখছেন না। এও এক আপাত খুশি করার প্রক্রিয়া। আজকের মতো তো ভোটটা মনস্তাত্ত্বিক রিগিং-এ পাওয়া গেল--- ব্যাস সেটাই তৃণমূলের মূল উদ্দেশ্য। নেগেটিভ মার্কেটিং এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিজ্ঞাপন যাকে বলা হয় Guerrilla marketing! সাধারণ মেধার এবং চিন্তাস্তরের মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জালের রহস্য ধরতে পারে না। নেসলে ম্যাগি থেকে শুরু করে বিএমডব্লিউ গাড়ি— কার হয়নি নেগেটিভ ক্যাম্পেইন? কিন্তু কার জনপ্রিয়তা কমেছে শুনি! বরং বলে Playing hard to get thingn— নেগেটিভ ক্যাম্পেইন ঠিক যেন সেটাই। দিদির দূত সেই বার্তাই হয়তো দিতে চাইছে— দেখ আমরা কিন্তু এমনি এমনি জয় চাই না। সমালোচনার পর আমাদের নির্বাচিত করা হোক। ভোট মার্কেটিং এজেন্ট আসলে দিদির দূত। মার্কেটিঙে প্রায়ই বলে— যদি বিশেষ কিছুই ভালো বলার না থাকে তবে বলতে হবে না জোর করে। ঠিক সেই থিয়োরিই পালন করছে দিদির দূতেরা। নেগেটিভ ক্যাম্পেইন সব সময়ই সহজ ও সোজাসাপটা নিশানার জায়গা। যা সমালোচকদের (ভোটার) মনোবল বৃদ্ধি করে। তারা মনে করেন এই সরকার আমাদের কথা শোনার অবকাশ দিচ্ছে। তাই যাদের কাছে অভিযোগ করছে তাদের ঝুলিতেই ব্যালট ছাপ পড়ে। ২০১৭-র ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও এমানিউল ম্যাকারনের ক্ষেত্রে কিছু নেগেটিভ ক্যাম্পেইন করা হয়েছিল— তিনি সমকামী, তিনি সিক্রেট কেবেলের অংশ ইত্যাদি। কী হলো? এবং ম্যাকারন নির্বাচনের পূর্বে একটাবারও এই ধরনের প্রচারের প্রতিক্রিয়া করেননি। যা তখনকার মতো তাঁর দুর্বলতা মনে হলেও আসলে তা ছিল তাঁরই প্রচার। একটু অন্য কায়দায় প্রচার।

Variation in the intensity of campaign communication and the content of attacks may influence voter's perception of negative campaign messages (Brooks and Geer 2007)— তাই দিদির দূত সাধারণ মানুষের কাছে তৃণমূলকে আরও কিছুটা জনতার কাছাকাছি, মাটির কাছাকাছি প্রতিপন্ন করেই ছাড়বে। যেন বার্তাটা পঞ্চায়েতের মুখে এইরকম হচ্ছে— তৃণমূল শুধুই সরকার চালায় না, শুধুই ক্লাবে মোচ্ছবের টাকা দেয় না, তৃণমূল লোক পাঠিয়ে কোথাও চুরিচামারি হলে বা কোথাও ১০০ শতাংশ কাজ না হলে— সে কথাও শোনে। নেগেটিভ ক্যাম্পেইনের ডিমোবিলাইজেশন হাইপোথিসিস এখন অতীত। দিদির দূত আবার তাই প্রমাণ করতে মরিয়া। কী হয়েছিল জয়ললিতার ক্ষেত্রে? এতো দুর্নীতি এতো টানাপোড়েন। সারাক্ষণ তাঁর দুর্নীতির খবর কাগজে টেলিভিশনে এবং মোড়ে মোড়ে। এই যে বহুল চর্চা অবশেষে তাইই মোড় ঘুরিয়েছিল ২০০২-এর উপনির্বাচনে। কখনও এমন বলছি না এই ধরনের রাজনৈতিক মডেল অনুসরণযোগ্য। কিন্তু ভোটার মনস্তত্ত্ব অনেক সময়ই অতিরিক্ত নেগেটিভ ক্যাম্পেইনে উলটো ফল দেয় তা অস্বীকারের উপায় নেই। তৃণমূল এমন একটি রাজনৈতিক দল যারা গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়। যারা অনুশাসন শুনলে ছিটকে যায়। যারা অনুদানের রাজনীতিতে চলে, উন্নয়নের নয়। যাদের অসংখ্য কুচো নেতার ম্যাজিকের মতো অট্টালিকা হয়ে গেছে। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নীতিহীন এক রাজনৈতিক শক্তি। চটকদারি বহরে এই ধরনের দল টিকে থাকার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক নাটক এবং মানুষকে আপাত বোকা বানানো, খুশি করার টেকনিক এদের অবলম্বন করতেই হয়। তাই দিদির দূতেরা আসলে এক একটা আস্ত নাট্যগ্রুপ যাদের জনতার কাছে গিয়ে সহনশীল হওয়ার অভিনয় করতে হচ্ছে।

টমাস জেফারসন আজ থেকে ২২৩ বছর আগে যে কৌশল নিয়েছিলেন— মানুষকে অবাধ সুযোগ দেওয়া ছিল নেতার বিরুদ্ধে যা খুশি সমালোচনার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া না দেওয়া এক অহিংস নীতিতে মনের ওপর দখলদারি। জনতার প্রজাতান্ত্রিক ধারণাকে পুনস্থাপন করা। এবং দিদির দূতেরা আসছে বলেই মানুষ তার প্রতিনিধিত্ব রূপের আনন্দ নিচ্ছে। প্রভাব মুক্ত নিরপেক্ষ সরকার গঠনের মিথ্যা স্বপ্ন দেখাতে পারছে তৃণমূল। এ একরকম ছদ্ম অভিভাবকত্ব; সরকার আছে তোমার পাশে, এই বার্তাই দিচ্ছে দিদির দূত। গণতন্ত্র একটা সেফটি ভালভ। তৃণমূল আমলে তা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। দিদির দূত সেই সেফটি ভালবের অভিনয় করতে চাইছে। এতক্ষণে এটা বুঝতে আর বাকি নেই দিদির দূত একটা পঞ্চায়েত টোটকা এবং রাজনৈতিক নাটক। জিজ্ঞাসা একটাই, দিদির দূত কোন সমালোচনা শুনতে চায়, গণতন্ত্রের সমালোচনা নাকি সরকারের? মানুষ কি গণতন্ত্র বিষয়ে চিন্তিত তাই অভিযোগ নাকি সরকারের সমালোচক। মানুষের মনে আক্ষেপ আতঙ্ক বিভ্রান্তি যে পাহাড় প্রমাণ তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই দিদির দূত যেই না যাবে অমনি হই হই করে মানুষ অসুবিধার ফিরিস্তি দেবে এবং দূতেরা দু' হাত তুলে সব সঙ্কটমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মনস্তাত্ত্বিক ভোটব্যাংক দখল করে আবার নিকটবর্তী ক্লাবে মোচ্ছব সেরে কালীঘাট ফিরবে।

গণতন্ত্র সম্পর্কে দার্শনিক প্লেটোর বিদ্বেষ ছিল--- তিনি বলতেন এ হলো মূর্খদের শাসন। প্লেটোর তত্ত্ব সমর্থন করি না কখনওই কিন্তু দিদির দূত যে মানুষকে আরও একবার বোকা বানাতে চাইছে তা নিয়ে দ্বিতীয় কোনো কথা হবে না। ■

বোলপুরে মধ্যবঙ্গ প্রান্ত গ্রাম বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ২৯ জানুয়ারি মধ্যবঙ্গ প্রান্ত গ্রাম বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয় বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের শ্রীনিকেতন সৃজনী শিল্প মন্দিরের মুক্তমঞ্চে। ১৩২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রান্তের ১৪ জেলার মধ্যে ৪ জন জেলা গ্রাম বিকাশ প্রমুখ, ১৩ জন উদয় গ্রাম বিকাশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র গ্রাম বিকাশ প্রমুখ অশোক পাড়ি। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, সহ ক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত, প্রান্ত কার্যবাহ মনোজ চট্টোপাধ্যায়, প্রান্ত প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত গ্রাম বিকাশ প্রমুখ সৌমেনকান্তি দাস। কর্মশালায় শিক্ষাযুক্ত, রোগমুক্ত, নেশামুক্ত, স্বচ্ছতা, প্লাস্টিক ও থার্মোকল বর্জন, ধর্মীয় সংস্কারযুক্ত, বিবাদমুক্ত আদর্শ গ্রাম নির্মাণের বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। জৈবকৃষি বিষয়ে চর্চা হয়। ভূমিশোধনের জীবামৃত তৈরি, বীজশোধন, কীটনিয়ন্ত্রক তৈরি ও তার ব্যবহারবিধি হাতে কলমে শেখানো হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন প্রান্ত গ্রাম বিকাশ প্রমুখ সৌমেনকান্তি দাস।

রাজপুত আর্য-ক্ষত্রিয় সমাজের রাজ্য সম্মেলন

গত ১৫ জানুয়ারি কলকাতার অহীন্দ্র মঞ্চে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো রাজপুর আর্য-ক্ষত্রিয় সমাজের ২০২৩ সালের রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য তথা শিক্ষাবিদ ড. মীনাক্ষী রায়। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ড. সৌমিত্র সিংহরায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রদ্যোত সিংহরায়, কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য মুকুল সিংহ।

ড. মীনাক্ষী রায় তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে বলেন, এখন সমাজ ব্যবস্থা খুবই টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। তিনি ক্ষত্রিয় সমাজের সবাইকে সংগঠিত হয়ে থাকার আবেদন জানান। পাশাপাশি তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সমাজের প্রত্যেককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার পরামর্শ দেন। ড. সৌমিত্র সিংহরায় তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। সংগঠনের সভাপতি প্রদ্যোত সিংহরায় আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেন, সমাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যুবসমাজকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদক মুকুল সিংহ

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে নারীশক্তি দিবস উদ্‌যাপন

উত্তরবঙ্গ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২৯ জানুয়ারি মালদা জেলার গাজোল হাজীনাকু উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে সারাদিনব্যাপী পালিত হলো জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী রানি গাইদিনল্যু জন্মদিবস উপলক্ষ্যে নারীশক্তি দিবস।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এলাকার জনজাতি মা-বোনেরা তাদের পরম্পরাগত পোশাকে সজ্জিত হয়ে ধামসা মাদলের তালে তালে নেচে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ঘাকসোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বৈবস্বতানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক স্বামী তাপহরানন্দ, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মন, কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা শক্তিপদ ঠাকুর, পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত জনজাতি গুরুমা কমলিনী সোরেন-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। পরিক্রমা শেষে সভা শুরু হয়। প্রথমে জনজাতি প্রথায় পূজ্য স্বামীজীদ্বয় ও গুরুমার পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। সকলকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হয়। অতিথিগণ প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গাজোল সংস্কার ভারতীর শিল্পী পল্লবী ঘোষ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রান্ত সভাপতি চন্দন মুর্মু। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতি সমাজের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মন, গুরুমা কমলিনী সোরেন, স্বামী তাপহরানন্দ, স্বামী বৈবস্বতানন্দ। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রীনিবাসের বোনেরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। একক গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতী মালদা জেলার সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার। জনজাতিদের উত্থানে স্বাধীনতা সংগ্রামী রানিমা গাইদিনল্যুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোকপাত করেন শক্তিপদ ঠাকুর। অনুষ্ঠানের মাঝে পাঁচজন জনজাতি মায়ের সাধভক্ষণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চাপালী চাকমা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রণতি কুণ্ডু ও মিতা রায় গোস্বামী। রাষ্ট্রবন্দনার পর ১০টি দলের সাঁওতালি নাচ-গান পরিবেশনের পর সবাই সহভোজে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের কেন্দ্রীয় বৈঠক

গত ২৭,২৮,২৯ জানুয়ারি গুজরাটের বর্তাল স্বামীনারায়ণ মন্দিরের মনোরম ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

সামাজির সমরসতা অভিযানের তিন দিবসীয় কেন্দ্রীয় বৈঠক ও অভ্যাস বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ৩১টি প্রান্ত থেকে বিভাগ ও তদূর্ধ্ব কার্যকতারা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় কার্যাধ্যক্ষ আলোক কুমারজী, কেন্দ্রীয় সম্পাদক ও সমরসতা প্রমুখ দেবজীভাই রাওত, পূর্বতন কেন্দ্রীয় সম্পাদক সঞ্জয় পাসোয়ান প্রমুখ এই বর্গে সামাজিক সমরসতার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তাঁদের সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেন। রামচরিতমানসকে বিকৃত করে যে ঘৃণিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, সে বিষয়ের নিন্দা করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৪ থেকে ২১ জানুয়ারি সারা দেশে যে সমরসতা সপ্তাহ পালন করা হয়, তারও প্রতিবেদন পাঠ করা হয়। এই বর্গে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ, সহ প্রান্ত প্রমুখ মিলে ৪জন এবং ক্ষেত্রীয় সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার যোগ দেন।

ধর্ম জিজ্ঞাসা— পাঁচ

সত্যই পথ, সেবাই ধর্ম

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ব্রহ্মজ্ঞানেই হয় মোক্ষলাভ

এও এক মায়ার খেলা। এই দেহ আর আত্মা যে এক নয়, একথা হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে বারবার বলা হয়েছে। কথাটি সকলে জানেন না তাও নয়। কিন্তু কথায় আছে না, জ্ঞানপাপীরা সব জেনেও না-জানার পথে যেতেই ভালোবাসে। সে কারণেই এমন বহু জ্ঞানী মানুষ আছেন যাঁরা অনেক কিছু জেনে বা বুঝেও শেষ পর্যন্ত অহং-এর দাসত্ব করেন। তাঁরা দেহটাকেই মনে করেন আত্মা। এই মনে করার কারণেই জ্ঞানী হয়েও জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে তাঁরা সহজে বেরিয়ে আসতে পারেন না। আর এটাকেই এক কথায় বলা হয় মায়ার সংসার বা মায়ার খেলা।

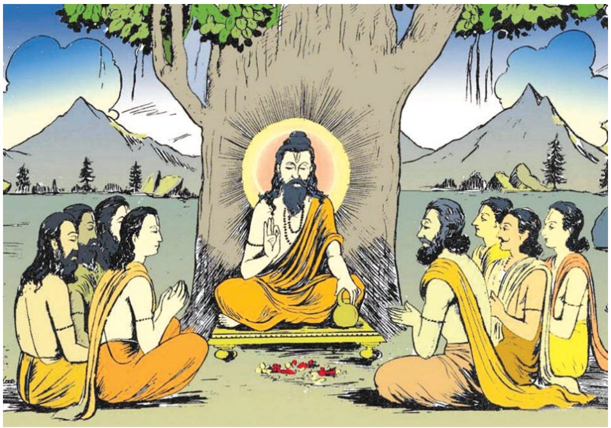

হিন্দুধর্মের লক্ষ্য, এই মায়ার বাঁধন ছেঁড়া। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক অতটা সহজ নয়। কেননা, শাস্ত্রবিদ এবং মুনি-ঋষিরা বলেন, যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি বা মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রহ্ম তো পূর্ণ ও শুদ্ধতম— তাঁকে তো চোখে দেখা যায় না, কথায়ও প্রকাশ বা গ্রহণ করা যায় না, এমনকী অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে তপস্যা বা অগ্নিহোত্র ইত্যাদি হোম বা যজ্ঞ করেও তাঁকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের মহিমায় যাঁদের অন্তর নির্মল— তাঁরাই ধ্যান করতে করতে সেই— 'বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' (মুণ্ডক উপনিষদ ৩।১।৮) বা নিরবয়ব ব্রহ্মকে দেখতে পান। আরও সহজ করে বলা হয়েছে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি 'ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুণ্ডক ৩।২।৯) অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌রা ব্রহ্মই হয়ে যান।

এতো গেল ব্রহ্মবিদদের কথা। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানতে চান যাঁরা সেইসব সাধকের কথা। কিন্তু সকলেই যদি ব্রহ্মকে জানার জন্য সাধনব্রত নেন, তাহলে সংসারের কী হবে? সংসারের বিবর্ধন কীভাবে ঘটবে? আর সংসারের বৃদ্ধিই যদি না হয়, তাহলে তো বিপন্ন হবে সৃষ্টিই। থেমে যাবে তার অগ্রগমনের রথও। তাহলে?

গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ!

এই তাহলেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তারচেয়েও বড়ো কথা, সেটাই যদি হয়, তাহলে হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে বর্ণাশ্রম এবং চতুরাশ্রম তার কী হবে? যদি গার্হস্থ্য আশ্রমই না থাকে তাহলে তো বাকি আশ্রমগুলি অবান্তর হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, গৃহস্থরাই তো বাণপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। গৃহস্থরা না থাকলে তো বিপন্ন হবেন সকলেই। গৃহস্থরাই তো বাকি আশ্রমস্থদের জীবন ধারণের উপকরণ জুগিয়ে তাঁদের সাধনাকে নির্ভাবনায় এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। এবং ওই কারণেই হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে বলা হয় চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। এই আশ্রমই সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে এখানেও। গৃহস্থাশ্রমই যদি শ্রেষ্ঠ, তাহলে তো অমন কৃচ্ছ্রসাধন করে তপস্যা করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। সকলে গৃহস্থ জীবন যাপন করলেই তো সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা তো অত সহজ নয়। নয় বলেই তো সমাজে চতুরাশ্রমের প্রবর্তনে শাস্ত্রের এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে। ব্রহ্মকে জানা বা তাঁকে পাওয়া তো তাহলে একটা অনায়াস ব্যাপার হয়ে উঠবে। জ্ঞানমার্গ এবং কঠোর সাধনমার্গের প্রবর্তন করার তো তাহলে কোনো প্রয়োজনই পড়বে না।

হ্যাঁ, এমন কথা বলতেই পারেন কেউ কেউ। উত্তরে বলা যায়, হিন্দু শাস্ত্রের কোনো নির্দেশই কেবল অঙ্গশোভার জন্য নয়। প্রত্যেকটির পেছনেই রয়েছে যথেষ্ট কারণ। সমাজ সংগঠনের জন্যই এর প্রত্যেকটির প্রয়োজন রয়েছে। এবং তাই রয়েছে শাস্ত্রের নিয়মনীতি। সাধন ভজনের জন্যও রয়েছে এক একরকম ব্যবস্থা। সেই নিয়ম মতো প্রতিটি আশ্রমের বিধিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেই অন্তিমে পাওয়া যায় যথার্থ ফল। গার্হস্থ্য আশ্রম তাই কেবলই বন্ধন নয়— এর মধ্যেও লুকিয়ে আছে মুক্তির পথ।

মানুষ ও পশু পৃথক শুধু সংস্কারে

বুধজনের বক্তব্য, পশুর মতোই মানুষের দেহটিও নানা জৈবিক উপাদান দিয়ে গঠিত। পার্থক্যটা সংস্কারের প্রশ্নে। কিছু সংস্কার থাকার কারণেই পশুর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে মানুষ। এই সংস্কার যদি না থাকত তাহলে মানুষের বৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পশুর আচরণের কোনো তফাতই থাকত না। কিন্তু

সব মানুষই যে সংস্কারের বশ অথবা সেই অস্থায়ী কাকজর্ম করেন বা বৃত্তি বেছে নেন তাও তো নয়। এবং তখন সেই মানুষ ও পশু পড়ে একই পর্যায়ে। সেই মানুষ তখন সংসার চক্রে বাঁধা পড়ে বারবার জন্ম-মৃত্যুর নাগরদোলায় ঘুরপাক খেতে বাধ্য হয়। বারবার দেহধারণ করতে হয় তাকে। তারচেয়েও দুর্ভাগ্য সেই দেহটাকেই নিজের সত্তা অথবা 'আমি' বলে মনে করে। আর তাতেই ঘটে বিভ্রাট। ভোগ করতে হয় অনবরত যাওয়া-আসার যন্ত্রণা।

পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, মানুষ তার নিজের ভুল বা ধর্মের কারণেই সবকিছুর আধার ও স্থিতিস্থান এক বিরাট ব্রহ্মচক্রে কেবলই ঘুরপাক খায়। জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করে। আর এটা হয়, ঈশ্বর বা পরমাত্মা থেকে নিজেকে পৃথক বলে মনে করার কারণে। যতক্ষণ এই বোধের নির্মোকের মধ্যে থাকে মানুষ ততক্ষণ চলে এই আবর্তন। কিন্তু মানুষ নিজেকে পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই পায় তাঁর অনুগ্রহ। সেই অনুগ্রহের ফলেই মানুষ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতত্ত্ব লাভ করে— 'তস্তেনামৃতত্বমেতি' (১।৬)। এটাই একটু ঘুরিয়ে মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, মানুষ যোগীজনসেবিত এবং দেহ থেকে ভিন্ন ঈশ্বর ও তাঁর মহিমা দর্শন করতে পারলেই হয় বিগতশোক (মুণ্ডক ৩।১।২)।

দেবত্বের জাগরণই মানব-সাধনা

আগেই বলা হয়েছে সংস্কারহীন মানবদেহ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে সংস্কার এবং মানুষের ওই পশু দেহে ঘুমিয়ে থাকা দেবত্ব। ওই ঘুমন্ত দেবত্বকে জাগিয়ে তোলাই হলো মানুষের সাধনা। ওই দেবত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই সংসারের এই আবর্তন চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জন্ম-মৃত্যুহীন আত্মাকে দেহের জৈবিক আচ্ছাদন থেকে মুক্ত করতে পারে যেসব কাজ সেটা করাই মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক। ওই মঙ্গলজনক কাজের মধ্য দিয়েই দেবত্বের শতদলকে প্রস্ফুটিত করা যায়। এবং এইসব মঙ্গলজনক বা শুভ কাজের সমষ্টিই হলো, প্রতিটি হিন্দুর 'ধর্ম'।

হৃদয়ের দেবত্বকে জাগিয়ে তুলতে বা বিকশিত করতে পারে যেসব কাজ তা যদি করা হয়, তাহলে উপকার বা মঙ্গল কেবল ব্যক্তির নয়, সমষ্টিরও। আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায়, সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মর উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই প্রয়োজনীয় কাজকর্মের মধ্যেই রয়েছে অহিংসা, সত্য, ঋত, তপস্যা। এদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বজগৎ।

সৃষ্টির সেই আদি মুহূর্ত থেকেই সৎ ও অসতের সহাবস্থান রয়েছে এই জীবদেহে। বৈচিত্র্যভরা সৃষ্টির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই পশুত্ব থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় মানবত্বের চরম অবস্থায়। অসৎ প্রবৃত্তি, কর্ম বা পাপের ভারেই সৃষ্টি চলে আসে ধ্বংসের খাদের কিনারায়। অন্যদিকে সৎ বা সাধুদের সৎকর্মগুলিই এই বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। সৃষ্টির সহায়ক এইসব কাজকর্মকেই সমষ্টিগত ভাবে বলা হয় ধর্ম। এই ধর্ম পালনের মধ্য দিয়েই মানুষ সন্ধান পায় মুক্তির পথের।

ধর্মের এই সংজ্ঞার আধারেই হিন্দুধর্মে জোর দেওয়া হয়েছে আচার, আচরণ ও চরিত্রের ওপর। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে এই তিনটি শব্দ অর্থাৎ আচার, আচরণ ও চরিত্র এসেছে একই 'চর্' ধাতু থেকে। চর্-এর অর্থ চলা। তাই মানুষের জীবনে এই তিনটি শব্দই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং একে অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টও বটে।

আচারই গড়ে চরিত্র

আচার বলতে বোঝায় জীবনযাপনের পদ্ধতিকে। যিনি যেমন আচার পালন করবেন তাঁর চরিত্রও হবে সেইরকম। যাঁরা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেন অহিংসা, সত্য, অদ্রোহ বা বিদ্বেষশূন্যতা, ক্রোধহীনতা, সরলতা, অতিথিসেবাকে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের মধ্যে বিজারিত হয় দৈবীভাব। শাস্ত্রে বলা হয় এটাই হলো ঈশ্বরের দেওয়া সম্পদ। কিন্তু এই দৈবী সম্পদ অর্জনের দিকে নজর না দিয়ে যাঁরা দম্ভ, দর্প, অভিমানকে বেশি গুরুত্ব দেন, অশুচি অবস্থায় কাজকর্ম করেন অর্থাৎ সদাচারের বদলে যাঁরা কদাচারকে অবলম্বন করেন, তাঁরা হন অসাধু চরিত্রের। তাঁদের ওইসব কাজের মধ্য দিয়ে যে সম্পদ তাঁরা অর্জন করেন তাকে বলা হয় আসুরী সম্পদ। কেবল এই জন্মে নয় পরবর্তী জন্মেও ওই সৎ বা অসৎ সম্পদ নিয়ে জন্মান তাঁরা। ভোগ করেন জন্মান্তরের অদৃশ্য কর্মের ফল। সদাচারীদের জীবন পরজন্মে ধাবিত হয় মুক্তি বা মোক্ষ সাগরের দিকে। অন্যদিকে আসুরী সম্পদের বোঝার ভারে কদাচারীদের যাত্রাপথ পদে পদে হয় বিঘ্নিত। মোক্ষ সাগরের কাছে যাওয়ার বদলে তাঁরা ক্রমেই যান পিছিয়ে, ডুবতে থাকেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে।

যাঁরা গৃহী তাঁরা যদি গৃহে থেকেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন, তাহলে তাঁরাও ওই দৈবীসম্পদেরই অধিকারী হন। ওই সম্পদের ধনে তপোব্রতীদের মতোই লাভ করেন সিদ্ধি— পরমার্থও।

বিষয়টা সহজ ভাবে বোঝানো হয়েছে মহাভারতে ধর্ম ব্যাধ আর ব্রাহ্মণ কৌশিকের কাহিনিতে।

কৌশিকের কথা

সেও এক পুরা কাহিনি। ব্রাহ্মণ কৌশিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তপস্যাকেই জীবনের ব্রত করে সাধন-ভজন-ধ্যানের মধ্যে দিন কাটান। একদিন তিনি একটি গাছের তলায় ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। এমন সময় একটি বক গাছের ওপর থেকে পুরীষ ত্যাগ করে। তা এসে পড়ে তাঁর গায়ে-মাথায়। ধ্যান ভেঙে যায় কৌশিকের। কোথা থেকে কে এই কুকর্মটি করেছে তা জানার জন্য তাকান গাছের ওপরের দিকে। তিনি তাকানো মাত্র পুড়ে ছাই সেই বক। কৌশিকের দৃষ্টির সামনে পড়ে ভস্মীভূত সেই বক।

ঘটনার আকস্মিকতায় কৌশিক বিস্মিত, আবার আনন্দিতও। তাঁর মনে হয় তপস্যার মধ্য দিয়ে তিনি অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছেন, 'দৃষ্টিমাত্র তিনি ভস্ম করে দিতে পারেন সকলকে। সিদ্ধির আনন্দে কৌশিক রওনা হন গ্রামের দিকে। উদ্দেশ্য মাধুকরী— ভিক্ষা সংগ্রহ। সেই সঙ্গে বাসনা, তিনি এবার সকলকে দেখাবেন তাঁর তপস্যার ক্ষমতা।

গ্রামে একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কৌশিক বলেন, ভবতি ভিক্ষাং দেহি—। তাঁর ডাক শুনে বেরিয়ে আসেন এক গৃহবধূ। কৌশিককে বলেন, একটু অপেক্ষা করুন,

আমি ভিক্ষা সাজিয়ে আনছি।

অপেক্ষা করতে থাকেন কৌশিক। মহিলাও ঘরে ভিক্ষাপাত্র সাজাতে বসেন। এমন সময় তাঁর পরিশ্রান্ত স্বামী আসেন সেখানে। মহিলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে স্বামীকে জল গামছা এগিয়ে দেন। তারপর তাঁর শ্রান্তি দূর করার জন্য বাতাস করতে থাকেন। কিছু পরে নিয়ে আসেন তাঁর জন্য কিছু খাবার।

এই ভাবে স্বামীসেবা করার পরই মনে পড়ল দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন ভিক্ষার্থী। তিনি অপেক্ষা করতে বলেছেন তাঁকে। তাই তাড়াতাড়ি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি বাইরে আসেন।

ওদিকে কৌশিক তখন রাগে যেন গরগর করছেন। তাঁর মতো সাধককে কিনা অবহেলা! তাও সামান্য এক নারীর!

কে এই নারী?

মহিলাকে দেখেই কটমট করে তাকান তাঁর দিকে। বলেন, তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বললে কেন? সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করলেই পারতে?

মহিলা বলেন, ক্ষমা করবেন। আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আমার স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তি করি। তিনি ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছিলেন। তাই তাঁর সেবা করে আসতে আমার এই দেরিটুকু হয়েছে। দয়া করে আমাকে মার্জনা করুন।

মহিলার কথায় কৌশিক আরও রুষ্ঠকণ্ঠে বলেন, ও, তুমি তাহলে ব্রাহ্মণদের গুরু বলে মানো না! স্বামীই তোমার সব। জানো না, দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের ভয় করেন আর তুমি সামান্য এক গৃহবধূ হয়ে কিনা ব্রাহ্মণকে অবমাননা করলে। জানো না ব্রাহ্মণরা আগুনের মতো! ইচ্ছে করলে পৃথিবী পর্যন্ত দগ্ধ করতে পারেন।

মহিলা বলেন, দয়া করে রাগবেন না। আমি বক নই যে আপনার কোপদৃষ্টিতে ভস্ম হয়ে যাব। দেবতার মতো পূজনীয় ব্রাহ্মণদের আমি কখনই অবমাননা করি না। আপনি দয়া করে শান্ত হয়ে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন। আমি ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা ও তেজের কথা ভালোভাবেই জানি। ব্রাহ্মণের ক্রোধের জন্য সমুদ্রের জল এখন লবণাক্ত, তা পান করা যায় না। কঠোরতপা মুনিদের প্রভাবের কথাও আমার আজানা নয়। কিন্তু একটা কথা কী জানেন, আমার মতো গৃহবধূদের পতিই পরম গুরু। তাঁকে সেবা করলেই সমস্ত ধর্ম পালন করা হয়। স্ত্রীর কাছে দেবতাদের চেয়েও বড়ো পতি। সে কারণেই আমি ভক্তিসহকারে সব সময় পতির সেবা করি। আর তার প্রত্যক্ষ ফল তো আপনি দেখতেই পেলেন। আপনার দৃষ্টি মাত্রই একটি বক যে পুড়ে ছাই হয়েছে, আমি তা জানতে পেরেছি আর আপনার ওই ক্রোধবহ্নি এখনও আমার কিছুই করতে পারেনি। আমি দিব্য দাঁড়িয়ে রয়েছি আপনার সামনে।

নারীর ধর্ম সেবা

ক্ষমা করবেন, হয়তো ছোটো মুখে বড়ো কথা হয়ে যাচ্ছে, তবুও আজ আপনাকে একটা কথা বলি। অকারণে রাগ করবেন না, ক্রোধ মানুষের বড়ো শত্রু। ক্রোধের জন্য মহর্ষিদেরও পতন হয়। তাই বলছি, সব কিছুর আগে ক্রোধকে জয় করতে হয়। ক্রোধের ফলে মানুষের পদে পদে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তার জন্য তাঁদের বহু সময় যে নানা অস্বস্তির পরিবেশে পড়তে হয়েছে তা তো আপনিও জানেন।

যিনি বীতরাগ, বীত মোহ অর্থাৎ ক্রোধ বা মোহকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করতে পারেন, সবসময় সত্যি কথা বলেন, সত্য পথে থাকেন, গুরুজনকে সদা-সন্তুষ্ট রাখতে পারেন যিনি, কেউ হিংসা করলেও যিনি প্রতিহিংসক হন না, সবসময় শুচিতা বজায় রেখে যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করে জিতেন্দ্রিয় হন, ধর্মপরায়ণ ও স্বাধ্যায়নিরত যিনি সমস্ত লোককে আপন বলে বিবেচনা করেন, সব ধর্মেই মতিমান যিনি যজন যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যথাশক্তি দান করে থাকেন, যিনি ব্রহ্মচারী অবস্থায় অপ্রসক্ত থেকে বেদ অধ্যয়ন করেন দেবতারা তাঁকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলেন। ব্রাহ্মণরা সবসময় সত্য কথা বলেন। ভুলেও তাঁদের মন মিথ্যার দিকে ছুটে যায় না। বেদপাঠী, সংযত চিত্ত, ইন্দ্রিয়জয়ী ও সত্যবাদী এবং সকলের কুশলকামীরাই ব্রাহ্মণ।

প্রাচীনরা বলেন, শাশ্বত ধর্ম অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যই তার ভিত্তিভূমি, শ্রুতিই তাঁর প্রমাণ। একটা কথা কী জানেন, ধর্ম নানারকম কিন্তু সব ধর্মই অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আপনি স্বাধ্যায়নিরত শুচি, ধর্মজ্ঞ; কিন্তু মনে হয় যথার্থ ধর্ম কাকে বলে তা আপনি জানেন না।

উদ্যত ফণা বিষধর সাপের মাথায় যেন পড়ে ওঝার মন্ত্রপূত ধুলো। সব ক্রোধ তখন অন্তর্হিত। নিজের ক্রোধের জন্য কৌশিক তখন অনুতপ্ত। তাই এবার বিনত কণ্ঠ। বলেন, ভুল আমারই হয়েছে। অন্যায় করেছি আমি। সামান্য কিছু পেয়েই অসামান্য শক্তির অধিকারী ভেবেছিলাম নিজেকে। প্রকৃত ধর্মের মর্ম না জেনেই মস্ত সাধকের অহমিকার জালে জড়িয়ে গিয়েছিল আমার মন— তাই আমি পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আজ আপনি প্রকৃত জননীর মতোই শাসন করলেন আমাকে, সেই সঙ্গে দেখালেন পথ। আপনার মঙ্গল হোক, শুভ হোক।

ওই মহিলা বলেন, আমি কেবল স্ত্রীর ধর্মই পালন করে চলেছি। গার্হস্থ্য জীবনে পতি ও পরিজনদের সেবাই একমাত্র ধর্ম। সেই ধর্ম সঠিক ভাবে পালন করতে পারলেই পাওয়া যায় বাঞ্ছিত যা। হয়তো এসবই আপনার জানা, তবুও বিবাহের সময় ঋগ্বেদের যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করা হয় তার কথা আপনাকে একবার স্মরণ করিয়ে দিই। ওই মন্ত্রে বলা হয়েছে— 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।/ ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।' (১০।৮৫।৪৬)। এর সাধারণ অর্থ তুমি শ্বশুর-শাশুড়ি -ননদ-দেবর ইত্যাদির উপর সম্রাজ্ঞী হও। কিন্তু এর গূঢ় মর্মার্থ হলো, পরিচর্যা ও ভালোবাসা দিয়ে পতিকুলের সেবা করাটাই ধর্ম এবং যথাযথ ভাবে সেটা পালন করতে পারলে গার্হস্থ্য আশ্রমে আর কোনো ধর্ম পালনের দরকার পড়ে না।

কৌশিক বলেন, আজ আমি বড়ো শিক্ষা পেলাম। এরজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

মহিলা বলেন, আমি সামান্য নারী। ধর্মের সবকিছু আমি জানি না। যদি সত্যই ধর্মের মর্মার্থ জানতে চান তাহলে মিথিলায় যান। সেখানে আছেন ধর্মব্যাধ। তাঁরই কাছে জানতে পারবেন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ।

সব জেনে ব্রাহ্মণ কৌশিক হলেন মিথিলা পথগামী। □

পরাধীন ভারতে নারীশিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ সাবিত্রীবাঈ ফুলে

দীপক খাঁ

পরাধীন ভারতে নারীর অধিকার, নিম্নজাতিভুক্ত বা জনজাতির জন্য সমাজসেবা, সাহিত্য ও শিক্ষা আন্দোলনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে। যিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন জাতীয়তার অর্থ কী, দেশপ্রেম আসলে কী। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে সমাজ সংস্কারক, কবি সাহিত্যিক, দলিত শিক্ষা তথা নারী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ সাবিত্রীবাঈ ফুলে।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ৩ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার নাইগাঁও গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে। পিতা খাণ্ডোজী লেভেশে পাটিল এবং মা লক্ষ্মীবাঈ। চার ভাইবোনের মধ্যে সাবিত্রীবাঈ ছিলেন বড়ো, বাকি তিনজন তাঁরই ছোটোভাই।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ১২ বছর বয়সি জ্যোতিরাও ফুলের সঙ্গে ৯ বছর বয়সি সাবিত্রীবাঈ ফুলের বিয়ে হয়। সেই সময়কার সমাজের রীতি অনুযায়ী আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে সাবিত্রীবাঈ ফুলেকেও নিরক্ষর থাকতে হয়। স্ত্রীশিক্ষায় বিশ্বাসী জ্যোতিরাও ফুলে আর সাবিত্রীবাঈ ফুলের শুরু হলো এক ব্যতিক্রমী দাম্পত্য সম্পর্ক।

কিছুকাল পরে জ্যোতিরাও বন্ধু উসমান শেখের বাড়ি চলে এলে সাবিত্রীবাঈ বন্ধু হিসেবে ওসমানের বোন ফতিমাকে সঙ্গে পেলেন। পুণেতে মিসেস মিচেলের নর্মাল স্কুলে সাবিত্রী ও ফতিমা পড়াশোনা তিনি ভর্তি হন শুরু করে। মিচেলের নর্মাল স্কুলের পর এক মার্কিন মিশনারি স্কুল মিসেস ফারহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং এখান থেকেই সাবিত্রীবাঈ ফুলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষা লাভ করেন। সাবিত্রীবাঈ ফুলেই হলেন ভারতের প্রথম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকা।

জ্যোতিরাও ফুলে পুণেতে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিলেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে। পরে জ্যোতিরাওয়ের সহযোগিতায় সাবিত্রীবাঈ মোট ১৮টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৩ সালে সাবিত্রীবাঈ ফুলে নিজের বাড়িতে মেয়েদের জন্য 'নিবেদিতা লাইব্রেরি' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী জ্যোতিরাওয়ের মৃত্যুর পর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত 'সত্যশোধক সমাজ'-এর ১৮৯৩-এ বার্ষিক সভার সভাপতিত্ব করেন। ১৮৫২ সালের ১৬ নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার দ্বারা সাবিত্রীবাঈ শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ভারতীয় ডাকবিভাগ তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৯৯৮ সালে ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ১৮৯৭ সালে পৃথিবীতে তৃতীয়বারের জন্য বিউবনিক প্লেগ নামক মহামারী দেখা দেয়। সাবিত্রীবাঈ প্লেগে আক্রান্ত হন এবং ১০ মার্চ ১৮৯৭ মৃত্যুবরণ করেন।

জ্যোতিরাও উপলব্ধি করেছিলেন প্রথাগত ভাবে নীচুজাতির মানুষদের শিক্ষিত করতে না পারলে সমাজের উন্নতি সাধন করা একেবারেই অসম্ভব। জ্যোতিরাও এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহারাষ্ট্রে 'সত্যশোধক সমাজ' নামে ১৮৭৩ সালে একটি সংস্থা তৈরি করেন। এই 'সত্যশোধক সমাজ'-এর কাজে সাবিত্রীবাঈ ফুলে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি এর মহিলা শাখার নেতৃত্ব দেন। ১৮৯০ সালে জ্যোতিরাও ফুলে মারা গেলে এই সংস্থার সকল দায়িত্ব নেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে। এই সমাজের সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলীগুলি হলো :

- মহারাষ্ট্রের নারী, শূদ্র, অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের ক্ষমতায়ন।
- সমাজের সমস্ত স্তরের, সমস্ত জাতির মানুষকে একত্রিত করা।
- সমস্ত মানুষ যাতে শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- সাধারণ মানুষকে অন্ধ কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত করা।
- এই সমাজে সম্পূর্ণভাবে পুরোহিত ও পণপ্রথাকে বর্জন করে অল্প খরচে বিয়ের ব্যবস্থা করা।

সত্যশোধক সমাজের সঙ্গে যুক্ত তথা কাজ করা ছাড়াও সাবিত্রীবাঈ ফুলের অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক কাজগুলো হলো :

- তিনি ১৮৫০ সালে 'মহিলা সেবা মণ্ডল' নামে একটি মহিলা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই 'মহিলা সেবামণ্ডল'-এর মূল কাজ ছিল সমাজে মেয়েরা পুরুষদের দ্বারা, নানাভাবে লাঞ্ছিত হতো, নিজেদের স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হতো। আবার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে বিধবাদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করাই এই সমিতির মূল লক্ষ্য।
- বিধবা মেয়েদের বিশেষ করে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ১৮৬৩ সালে 'বালহত্যা প্রতিবন্ধক গৃহ' স্থাপন করেন সাবিত্রীবাঈ। এখানে সন্তান প্রসব থেকে, সন্তান দত্তক নেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানে ১৮৮৪ সাল নাগাদ ৩৫ জন ব্রাহ্মণ বিধবা আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সাবিত্রীবাঈ ফুলে সমাজ সচেতনমূলক বেশ কয়েকটি কবিতা লেখেন। সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি দুটি কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। যথাক্রমে— কাব্যফুলে (১৮৫৪), বঙ্গ কাশী সুবোধ রত্নাকর (১৮৯২)। তাঁর ভাষণগুলি নিয়ে যে গ্রন্থ সেটি হলো : 'স্পিচেস অব মাতশ্রী সাবিত্রীবাঈ। (১৮৯২)। এগুলি ছাড়াও তিনি 'জ্যোতিবাঞ্চি ভাষণে' (১৮৫৬) নামে জ্যোতিরাওয়ের ভাষণের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সাবিত্রীবাঈ ফুলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে যে প্রদীপের আলো জ্বালেন, সেই প্রদীপের আলোতে পথ দেখান সমস্ত প্রজন্মকে। □

রোমিলা থাপারের কলোনিয়াল হ্যাংওভার এখনও কাটেনি

গোপাল চক্রবর্তী

কতিপয় পাশ্চাত্য মতাদর্শী, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিরোধী কাঙালদের একটা দল আছে। শুধু হিন্দুধর্ম নয়, স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্যের বিকৃত বিশ্লেষণেও এঁরা সিদ্ধহস্ত। এঁদের পৃষ্ঠপোষক বিকৃতমনস্ক সেকুলাররা। স্বাধীন ভারতবর্ষে এঁরাই ছাত্র যুবসমাজের কাছে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের বদলে তুলে ধরেছেন ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে এক পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস।

সম্প্রতি দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সিডি দেশমুখ স্মারক বক্তৃতায় বক্তা হিসাবে রোমিলা থাপার আমন্ত্রিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আমাদের ইতিহাস, তাদের ইতিহাস, কাদের ইতিহাস।' বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে ৯১ বছর বয়সি থাপার আরেকবার আক্রমণকারী মুসলমান শাসকদের উদারতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে সমসাময়িক হিন্দু শাসক এবং হিন্দু প্রতিভাকে ছোটো করে দেখিয়েছেন।

উদারতার কথা যদি বলতে হয় তবে প্রথমেই আসে বীর পৃথ্বীরাজ চৌহানের কথা। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করেও তিনি পরাজিত ঘুরিকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কৃতঘ্ন ঘুরি পরের বছর তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে রাতের অন্ধকারে পৃথ্বিরাজকে বন্দি করে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল। প্রথম যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরিকে ক্ষমা না করলে ভারতের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হতো।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে রাণা সঙ্গের (সংগ্রাম সিংহের) নেতৃত্বে সম্মিলিত রাজপুত শক্তি পরাজিত হয় মুঘল বাবরের কাছে। এই পরাজয়ের কারণ বাবরের বীরত্ব নয়, ভারতবর্ষে বাবর প্রথম বারুদের ব্যবহার করেছিল ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের পানিপথের যুদ্ধে, খানুয়ার যুদ্ধেও ব্যাপকভাবে বারুদের ব্যবহার হয়। ফলে শুধুমাত্র ঢাল, তলোয়ার, তির-ধনুক আর বর্শাধারী রাজপুত বাহিনী সহজে বিপর্যস্ত হয়। মূলত তারপর থেকেই রাজপুত শক্তির অবক্ষয় শুরু হয়। পরবর্তী রাজপুত রাজাদের অনেকেরই প্রবল পরাক্রান্ত ধর্মান্ধ মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা ও সাহস ছিল না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মোগলদের বশ্যতাও স্বীকার করতে বাধ্য হলো। এমন দুই উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা মান সিংহ ও টোডরমল। এঁদের দুজনকেই প্রবল সাম্রাজ্যবাদী আকবর তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করেছিল। এই দুইজনই ছিলেন রাজপুত সমাজে ব্রাত্য। রাণাপ্রতাপ মানসিংহের সঙ্গে ভোজন পর্যন্ত করেননি। ক্ষুব্ধ মানসিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

আমরণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মহান রাজপুত রাজাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এই তথাকথিত প্রগতিশীলরা? ইতিহাস চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের কাছে আফগান ও মুঘলদের বিরোধের কথা অজানা নয়। বিধর্মী আফগান সেনানী হাকিম খান সুরিকে পুনর্বাসন দিয়ে রাজপুতরা মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। হাকিম খান সুরিও জাত শত্রু মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের মতো ভারতবর্ষেও শিয়া সুন্নি বিরোধ ইতিহাসের চর্চার বিষয়। সুন্নি মতাবলম্বী মুঘলরা বরাবর শিয়া বিরোধী। দক্ষিণ ভারতের শিয়া মতাবলম্বী বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর থেকে নির্যাতিত মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল শিবাজীর মহারাষ্ট্র। আফগান আহমদ শাহ আবদালির সঙ্গে মারাঠাদের তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধেও মারাঠা পক্ষের সেনাপতি ছিলেন ইব্রাহিম কার্দি। এই ইব্রাহিম কার্দি কোনো মুসলমান রাজ্যে যোগ্য মর্যাদা না পেয়ে মারাঠাদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মারাঠারাও এই বীরকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। যদিও পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী পরাজিত হয় এবং অনেক মারাঠা বীরের সঙ্গে ইব্রাহিমও প্রাণ হারান।

সুলতান মামুদ থেকে আওরঙ্গজেব এঁদের হাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক ভারতীয়দের আবেগজড়িত অসংখ্য হিন্দু মন্দির হয় ধ্বংস, নয় মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রগতিবাদী ঐতিহাসিকেরা এইসব ঘটনাকে আক্রমণকারীদের বীরত্ব হিসেবে দেখিয়েছেন। অথচ রামজন্মভূমির রামমন্দির ধ্বংস করে বাবরের নির্দেশে গড়ে ওঠা বাবরি মসজিদ ধ্বংস হলে এদের ঘুম উড়ে যায়।

গল্প তৈরি করে কুতুবমিনারের গায়ে উৎকীর্ণ ভুল সংস্কৃত শ্লোক এঁদের চোখে পড়ে। রাজস্থানের আজমিরে অবস্থিত হিন্দুমন্দির ও সংস্কৃত শিক্ষায়তন ভেঙে মুহম্মদ ঘুরির নির্দেশে আড়াই দিনের মধ্যে কুতুবউদ্দিন মসজিদ নির্মাণ করে। এই মসজিদের নাম 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া।' মন্দিরের ৩০টি স্তম্ভের উপরে মসজিদের গম্বুজ। স্তম্ভগুলিতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা। এটিকে হিন্দু স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন বলা যায়। আমাদের সেকুলার ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি কিন্তু এই স্তম্ভগুলির দিকে পড়ে না, এখানে তাঁরা চোখ বুজে থাকেন।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিতশাহ ইতিহাসে উপেক্ষিত মৌর্য, গুপ্ত ও চোল রাজাদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার আহ্বান জানিয়েছেন। সুলতানি আর মুঘলদের গণ্ডী ছাড়িয়ে এবার প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের সময় এসেছে।

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান ধ্বনি এদের কানে ঢোকেনি। 'ক্যালকাটা কিলিং' 'নোয়াখালির গণ হত্যা' এঁদের কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

সুলতানি ও মুঘলদের ধর্মান্ধ আক্রমণকারী বললে থাপারদের প্রাণে বড়ো ব্যথা লাগে। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান ধ্বনি এদের কানে ঢোকেনি। 'ক্যালকাটা কিলিং' 'নোয়াখালির গণ হত্যা' এঁদের কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। গোধরার নরসংহার এরা চেপে যান, নিশ্চুপ থাকেন। কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে গুজরাট দাঙ্গা— তখন এঁদের চোখের জল তো বাঁধ মানে না, আহার নিদ্রা ত্যাগ, শোকে বিহবল তারা। আসলে গোধরার হতভাগ্যদের প্রাণ তো প্রাণ নয়, ওরা যে হিন্দু, তাতে আবার করসেবক। তাই ওদের জন্য শোক নয়।

ফঃ ৫

মিসিং লিংক

সিগিরিয়ায় রাবণের দুর্গের সত্যিমিথ্যে

সন্দীপ চক্রবর্তী

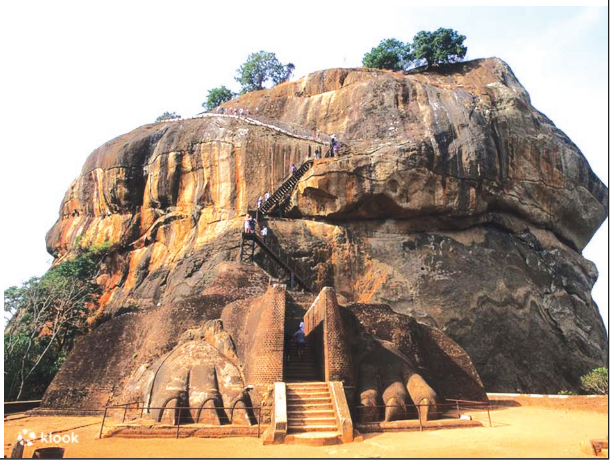

জায়গাটা শ্রীলঙ্কার সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মাতালে জেলার ছোট্ট শহর ডামবুলার কাছাকাছি। ইউটিউবের সৌজন্যে নামটা অনেকেরই খুব চেনা মনে হবে, সিগিরিয়া। আরও একটা কথা সকলের জানা, এই সিগিরিয়ার (সিংহগিরির অপভ্রংশ) লায়নস রকে ছিল রাবণের দুর্গ। সিংহের আদলে তৈরি ১৮০ মিটার উচ্চতার লায়নস রকের গা ছমছমে পরিবেশে রাবণের দুর্গের আইডিয়াটি নিঃসন্দেহে চমৎকার। কিন্তু সত্যিই এখানে রাবণের দুর্গ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে কোনও পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। শ্রীলঙ্কার পুরাতাত্ত্বিকেরা শুধু এইটুকু জানতে পেরেছেন সিগিরিয়া পাহাড়ের পূর্বপ্রান্তে হাতির আকৃতির একটা পাথর আছে। সিংহলী ভাষায় একে বলে আলিগালা। ইংরেজিতে এলিফ্যান্ট রক। আলিগালার গুহায় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ৫,৫০০ বছর আগেকার মনুষ্যবসতির প্রমাণ পেয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ৫,৫০০ বছর আগেই কি রামায়ণের ঘটনা ঘটেছিল? তা যদি না হয় তাহলে সিগিরিয়ায় রাবণের দুর্গ ছিল একথা জোরের সঙ্গে বলা যাবে না। আবার রামায়ণের ঘটনা ঠিক কোন সময়ে ঘটেছিল তাই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। আমরা কোনও বিতর্কে না গিয়ে সহজ উপায়ে একটা আইডিয়া খোঁজার চেষ্টা করতে পারি। কেকয় প্রদেশের রাজধানী গিরিব্রজ থেকে ভরত ও শত্রুঘ্ন যে-পথে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ বাল্মীকি দিয়েছেন। এই বিবরণ অনুযায়ী ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় আসার পথে বিশাল সরস্বতী নদী পার হয়েছিলেন। এখানে রয়েছে প্রথম ক্লু। শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলে ট্যাকটনিক শিফটের ফলে প্রথমে যমুনা পূর্বদিকে সরে গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর শতদ্রুর মাধ্যমে হিমালয়ের বরফগলা জল সরস্বতীতে মিশে তাকে সারা বছর পুষ্ট রাখত। বরফগলা জলের উৎস সরে যাওয়ায় সরস্বতী শুকিয়ে যেতে শুরু করে। এবং আজ থেকে ৬,০০০ বছর আগে সরস্বতী সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, মহাভারতের সময়ে সরস্বতী কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সরোবরে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং রামায়ণের ঘটনা কমপক্ষে ৬,০০০ বছর আগে ঘটতে হবে। অন্যথায় ভরত ও শত্রুঘ্নের বিশাল সরস্বতী পার হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এলিফ্যান্ট রকের গুহায় প্রাচীন যে মনুষ্যবসতির প্রমাণ মিলেছে তার বয়েস ৫,৫০০ বছর। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে সরস্বতী যখন অবলুপ্ত হবার পথে সেইসময় সিগিরিয়ার

লায়নস রকে মানুষের বসবাস ছিল। কিন্তু এর থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে ৫, ৫০০ বছর আগে লায়নস রকে যারা বাস করতেন তাদের রাজা ছিলেন রাবণ। আরও একটা প্রশ্ন এখানে তোলা যেতে পারে। রামায়ণের ঘটনা কি ৬০০০ বছর আগেই ঘটেছিল? বস্তুত, সরস্বতীর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে ৬, ০০০ বছর আগে শুকিয়ে যাওয়া অবধি— এই বিশাল কালখণ্ডের যে কোনও সময়ে রামায়ণের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু ঠিক কবে হয়েছিল আমাদের জানা নেই। তবে আজকের শ্রীলঙ্কা আর রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কাপুরী এক কিনা সেই ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের গবেষক শ্যামসুন্দর দাস আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে আজকের শ্রীলঙ্কা আর রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কাপুরী এক নয়। ভারত থেকে শ্রীলঙ্কার দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার (৬২ মাইল)। অথচ বাল্মীকি রামায়ণে লিখেছেন, 'উপকূল (ভারতীয় উপকূল) থেকে একশো যোজন দূরে সুরম্য দ্বীপভূমিতে অবস্থিত লঙ্কা। ১ যোজন মানে ১২.৫ কিলোমিটার। ১০০ যোজন = ১২৫০ কিলোমিটার। অর্থাৎ ভারতের উপকূল থেকে লঙ্কার দূরত্ব ১২৫০ কিলোমিটার। এই দূরত্বের কথা রামায়ণে একাধিকবার এসেছে। কারণ লঙ্কায় পৌঁছতে হলে এই দূরত্ব অতিক্রম করতেই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে রামসেতু নির্মাণ করা হয়েছিল তার দৈর্ঘ্য ছিল ১২৫০ কিলোমিটার। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ২২.৭৬ শ্লোক অনুযায়ী প্রস্থে রামসেতু ছিল ১০ যোজন অর্থাৎ ১২৫ কিলোমিটার।

শুধু তাই নয়, শ্রীলঙ্কার পশ্চিম উপকূল থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে ছিল রামায়ণের লঙ্কা। সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অবন্তী (উজ্জয়িনী) শহর মূলমধ্যরেখার (Prime Meridian) কাছেই। সূর্যসিদ্ধান্ত আরও বলছে, মূলমধ্যরেখার কাছে রয়েছে আরও একটি শহর, সেই শহরে রাক্ষসদের বাস। অর্থাৎ শহরটি হলো লঙ্কা। প্রতিটি সিদ্ধান্তই বলেছে লঙ্কার কোনও অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ ছিল না। মূলমধ্যরেখার কাছে হওয়ার জন্য অক্ষাংশ থাকবে না। আর দ্রাঘিমাংশ না থাকার কারণ রামায়ণের লঙ্কার ওপর দিয়ে গেছে বিষুবরেখাও। অথচ শ্রীলঙ্কা বিষুবরেখার সাত ডিগ্রি উত্তরে। রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী সম্ভবত মালদ্বীপের কাছে ছিল রাবণের লঙ্কাপুরী। এখন সম্ভবত সেই লঙ্কাপুরী সমুদ্রের নীচে চলে গেছে। এই প্রসঙ্গে হিমযুগে (Ice Age) সমুদ্রের জলস্তরের হ্রাসবৃদ্ধির কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা এখন যে হিমযুগে রয়েছি তার নাম কোয়াটারনারি গ্ল্যাসিয়েশন। একে প্লিসটোগিন গ্ল্যাসিয়েশনও বলে। এই কোয়াটারনারি যুগ শুরু হয়েছিল ২.৫৮ লক্ষ বছর আগে। তারপর আধুনিক সময়ে এসে পৌঁছেছে। বলাবাহুল্য, আমরা এখন ইন্টার গ্লেসিয়াল (উষ্ণযুগ) সময়পর্বে রয়েছি।

এক একটি হিমযুগ ৪০,০০০—১, ০০,০০০ বছর পর্যন্ত চলতে পারে। ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০,০০০ বছর আগে সমুদ্রের জলস্তর এখনকার তুলনায় ১৩০ মিটার কম ছিল। বাল্মীকির ভাষ্য অনুযায়ী রামায়ণের ঘটনা ঘটেছিল ত্রেতাযুগে। অর্থাৎ ৯,০০,০০০ বছর আগে। বলাবাহুল্য, এত পুরনো পাথুরে প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। হাতের কাছে যা আছে তার সবই অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ডেটা। আর কিছু ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ। ধরে নেওয়া যেতে পারে হিমযুগ ও মধ্যবর্তী উষ্ণযুগের সাইকেল অনেকটা ঋতু পরিবর্তনের মতো বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সেই হিসেবে হিমযুগের সময় সমুদ্রের জল বরফে পরিণত হবার জন্য সমুদ্রের জলস্তর নেমে যাওয়ার ঘটনাও খুব সাধারণ। ১৩০ মিটার জলস্তর নেমে যাওয়ার ঘটনাকে গড় হিসেবে ধরলে দেখা যাক আমরা কোথায় পৌঁছই। হিমযুগের সময়কার একটি মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা আদতে কোনও দ্বীপ নয়। সেই সময় শ্রীলঙ্কা ছিল ভারতের স্থলভাগের অংশবিশেষ। এই ক্লু নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করছে শ্রীলঙ্কা আর রামায়ণের লঙ্কাপুরী এক নয়। এরপর যা দেখছি তা আরও চমকপ্রদ। মূলমধ্যরেখা অবন্তীর (উজ্জয়িনী) উপর দিয়ে গিয়ে ঠিক যেখানে বিষুবরেখাকে স্পর্শ করেছে সেখানে সর্বশেষ হিমযুগের সময়েও একটি দ্বীপ ছিল। রামায়ণের ঘটনা যদি হিমযুগের সময়ে বা সমুদ্রের জলস্তর নেমে যাওয়ার সময়ে হয়ে থাকে তাহলে রামায়ণ ও সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই দ্বীপেই ছিল রাবণের স্বর্ণলঙ্কা।

সুতরাং রামায়ণের লঙ্কাপুরী আর আজকের শ্রীলঙ্কা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে। আর শ্রীলঙ্কা যদি রামায়ণের লঙ্কা নাই হয় তাহলে সিগিরিয়ায় রাবণের দুর্গের অস্তিত্ব কীভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব? অবশ্য রাবণ যদি শ্রীলঙ্কায় (যার প্রাচীন নাম সিংহল) উপনিবেশ করে থাকেন তাহলে সেটা স্বতন্ত্র বিষয়। রাবণ যে অত্যাচারী ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের জনজাতি ও বনবাসী গোষ্ঠী পরিচালিত ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি অন্যায়ভাবে দখল করে সেখানে নিজের প্রতিনিধির হাতে শাসনভার তুলে দিতেন, তার প্রমাণ রামায়ণে আমরা পাই। সেই হিসেবে সিংহল রাক্ষস সাম্রাজ্যের অংশ হতে পারে। কিন্তু সিংহল বা রামায়ণের লঙ্কা অভিন্ন কিনা তাই নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। □

অনূর্ধ্ব উনিশ টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বসেরা ভারত

নিলয় সামন্ত

প্রথমবার অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হলো। প্রথমবারেই জিতে নিল শেফালি বর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতের মহিলা দল। মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামীর মহিলা দল দুবার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেও জিততে পারেনি। বিশ্বকাপ না পাওয়ার খেদ নিয়েই তাঁদের অবসর নিতে হয়েছে। সেই স্বপ্ন পূরণ হলো শেফালি, তিতাস, রিচাদের হাত ধরে।

ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে প্রথম অনূর্ধ্ব ১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরই শেফালিদের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিশ্বকাপ জয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে জয় শাহ সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতে মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নতি হচ্ছে। বিশ্বকাপ জয় মহিলা ক্রিকেটের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিল। পুরো দল এবং কোচিং স্টাফদের জন্য ৫কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছি। এই পুরস্কার ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এই বছরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও লেখেন, ' আমি শেফালি বর্মা ও তাঁর বিশ্বজয়ী দলের সদস্যদের আমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই দুর্দান্ত জয়ের পর উৎসব হওয়া উচিত।'

মহিলাদের অনূর্ধ্ব১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও। প্রায় সকলেই মনে করছেন, ভারতের মহিলা ক্রিকেটের নতুন পথ চলা শুরু হলো। এবারই প্রথম এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে আইসিসি। ফাইনালে প্রথম ব্যাট করে ইংল্যান্ড ১৭.১ ওভারে করে ৬৮ রান। জবাবে ভারত ১৪ ওভারে করে ৩ উইকেটে ৬৯ রান। ৪ ওভার বল করে ৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের জোরে বোলার তিতাস সাধু। ম্যাচের পর কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন শেফালি। সাধারণত অনূর্ধ্ব১৯ ক্রিকেট খেলে সিনিয়র দলে সুযোগ পান ক্রিকেটাররা। শেফালি ও আরও কয়েকজন মহিলা ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটো। তাঁরা আগেই সিনিয়র দলে খেলেছেন। তবু যেকোনো বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদই অন্যরকম। সেটা মাথায় রেখেই শেফালি বললেন,' যেভাবে দলের প্রত্যেকে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে, সারা সময় খেলেছে, তাতে আমি খুবই খুশি। দলের স্টাফদেরও ধন্যবাদ। গোটা প্রতিযোগিতায় তাঁরা আমার পাশে ছিল এবং মনে করিয়ে দিয়েছে, ট্রফি জেতার জন্য ঠিক কী করতে হবে। সতীর্থদেরও সমর্থন পেয়েছি। বোর্ডকেও অনেক ধন্যবাদ আমাকে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।'

শ্বেতা সেহরাওয়াতের জন্য আলাদা করে প্রশংসা করলেন শেফালি। বলেছেন, ' যা পরিকল্পনা ছিল সব নিখুঁতভাবে কাজে লাগিয়েছে ও। এছাড়াও অর্চনা, সৌম্যা, আরও বাকিরা রয়েছে।' বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শেফালি। মেয়েদের এই দলের কোচ নুশিন খান কাদির, যিনি ২০০৫ বিশ্বকাপে খেলেছেন মিতালি, ঝুলনদের সঙ্গে। সেবার বিশ্বকাপ পাননি। এবার কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ পেলেন। নুশিন বলেন, ' অনেকদিন ধরে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। আমাদের দলের কতটা গভীরতা রয়েছে সেটা প্রমাণ করে দিল এই ট্রফি। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখাই সাফল্যের সবচেয়ে বড়ো কারণ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটা খারাপ ম্যাচ গিয়েছে। তারপরেও যেভাবে ওরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা প্রসংসাযোগ্য।

তিতাস সাধুর হাত ধরেই মহিলাদের প্রথম অনূর্ধ্ব ১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ম্যাচের সেরা হুগলীর তিতাস। ফাইনাল ম্যাচে মেয়ের এমন পারফরম্যান্স দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠেছে বাবা রণদীপ সাধুর। প্রৌঢ় বলেন, 'বড়ো ম্যাচে মেয়ে বরাবরই ভালো ফল করে। আমি নিশ্চিত ছিলাম এই ম্যাচেও মেয়ে ভালোই খেলবে।' তিতাস চুঁচুড়ার বাসিন্দা। চুঁচুড়ার মাঠে খেলেই তাঁর ভারতীয় দলে খেলার সুযোগ হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনিংসের শুরুতেই ৪ ওভারে ৬ রান দিয়ে ২টি উইকেট তুলে নিয়েছেন জোরে বোলার তিতাস। আর তাতেই বদলে গিয়েছে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি। তাঁর বাবা বলেন, মেয়ে খুব ভালো খেলেছে। শুধু আমার মেয়েই নয়, সকলেই ভালো খেলেছে। নইলে এভাবে জেতা যায়!

তিতাসের কোচ প্রিয়ঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, তিনি যেমনটা চেয়েছেন, সেমি ফাইনাল থেকে তেমনই খেলেছেন তিতাস। তাঁর কথায়, ' খুবই আনন্দ হচ্ছে। বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এই ধরনের পারফরম্যান্স! ভবিষ্যতে ওর জন্য আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করছে। □

পুঁই মিটুলি আর শাক চচ্চড়ির গন্ধে জিভে জল নেটিজেনদের

বিশেষ প্রতিনিধি॥ শীতের সকালে বাড়ির বাগান থেকে পালং শাক, ধনেপাতা, মুলো, গন্ধরাজ লেবু, লাল শাক, কাঁচালঙ্কা, পুংকা শাক, বেগুন, মুলো শাক, কুমড়ো, মটরশুঁটি, গাজর, আলু তুলে আনলেন পুষ্পরানি সরকার। কুটনো কুটে, কাঠের আগুন জ্বেলে, মাটির হাঁড়িতে চাল, ডাল আর সমস্ত শাকসবজি একপাকে দিয়ে রান্না করলেন সুস্বাদু ফেনা ভাত। পুষ্পরানিকে সাহায্য করলেন তাঁর বউমা কবিতা সরকার। পরিবারশুদ্ধ লোক সেই আটপৌরে ফেনাভাত দিয়েই সারলেন সকালের খাবার। পুরোটাই মোবাইল ক্যামেরায় ধরা থাকল। শুধু তাই নয়, এই ফেনাভাত রান্নার ভিডিয়ো আপলোড করা হলো ইউটিউবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাইরাল। লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের বন্যা। পুষ্পরানির ফেনা ভাতের রেসিপি পাড়াগাঁয়ের খড়ের চালের হেঁশেল পেরিয়ে পৌঁছে গেল হিউস্টনের ওপেন মডিউলার কিচেনে।

৮৩ বছরের পুষ্পরানি সরকার একজন গৃহবধূ। গ্রাম বাঙ্গলার অতি সাধারণ সব পদ রান্না করেন। কাঁচকলার কোপ্তা, নানারকমের ইলিশ ভাপা, কচুর শাক, থানকুনি পাতার চচ্চড়ি, লাউয়ের ঘন্ট, কুমড়ো ফুলের বড়া, চিতলের মুইঠ্যা— জিভে জল আনা রকমারি সব পদ। না গ্যাস ওভেন, না প্রেসার কুকার। নেই হালফিলের মিক্সার-গ্রাইন্ডারও। তিনি রান্না করেন বাড়ির উঠোনে পাতা উনুনে, মাটির হাঁড়িতে, পুরোদস্তুর শিলনোড়ায় মশলা বেটে। সেই রান্নার ভিডিয়ো রেকর্ড করে তাঁর নাতি ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করেন।

বাঙ্গালির একেবারে নিজস্ব ঘরানার রান্না সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে জুলাই, ২০১৭-তে একটি ইউটিউব চ্যানেল (Vlog) খোলেন পুষ্পরানির নাতি কাজল। নাম দেন 'ভিলফুড'। যেখানে পুষ্পরানির হাতে তৈরি খাবারের ভিডিয়ো পোস্ট করা হতো। শুরুটা ঢিমে আঁচে হলেও ক্রমে 'ভিলফুড ব্লগ' নজর কাড়ে নেটিজেনদের। এক মাসের মধ্যেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা। শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইংল্যান্ড, আমেরিকা থেকে অসংখ্য বিদেশি ফ্যান রয়েছে পুষ্পরানি সরকারের। শুধুমাত্র চীন থেকেই ৪৬ হাজার সাবস্ক্রাইবার ভিলফুড ব্লগের প্রতিটি পোস্ট প্রতিদিন দেখেন। পুষ্পরানি সরকারের জনপ্রিয়তা তাঁকে ইদানীং সমাজমাধ্যমের তারকায় পরিণত করেছে।

বীরভূম থেকে ইলামবাজার যাওয়ার পথে একটি প্রত্যন্ত গ্রাম বনভিলা। সেখানেই থাকেন ৮৩ বছরের পুষ্পরানি সরকার। হাতা, খুন্তির হাতযশে অজ গ্রামের এই বৃদ্ধাই আজ ইউটিউব স্টার। শুরুটা হয়েছিল অন্যভাবে। নাতি কাজল সরকার রান্নাবান্নার খুব শৌখিন। নিজে রাঁধতেও জানেন ভালো। অবসর সময় তাঁর কাটে দেশ-বিদেশের বিচিত্র রান্নার রেসিপি দেখে। কিন্তু সেখানে বাঙ্গালি রান্না তেমনভাবে পাওয়া যায় না, যেমনটা তাঁর ঠাকুমা পুষ্পরানি রাঁধেন। সেই ভাবনা থেকেই 'ভিলফুড ব্লগ'-এর সূচনা। কাজল বলেন, ''ছোট থেকে ঠাকুমার হাতের রান্না খাচ্ছি। যে খায় সে-ই আঙুল চাটে। তাই ঠাকুমার কথা ভেবেই চ্যানেলটা করা। প্রথম দিকে তেমন সাড়া পেতাম না। এক একদিনে ২৫টা করে রান্নার রেসিপি পোস্ট করার পরও ১০০'র বেশি লাইক হতো না।''

এখন পুষ্পরানি সরকারের নতুন নতুন রেসিপি দেখতে তাঁর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন ১৫ লক্ষ মানুষ। এর থেকেই বছরে ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা উপার্জন হয় পুষ্পরানির। ইউটিউবে সার্চ করলেই একগাদা রান্নার ভিডিয়ো হুমরি খেয়ে পড়ে। অথচ এত ভিড়ের মধ্যেও বীরভূমের ৮৩ বছরের বৃদ্ধার রান্নার রেসিপি স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। বাঙ্গালির পাতে অতি সাধারণ যে পদগুলো হেঁশেল থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, সেগুলোই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন ফোকলা হাসির ঠাকুমা। আজ থেকে ৩০ বছর আগে গ্রামের গৃহিণীরা যেভাবে কাঠের উনুনে রান্না করতেন— পুকুরের জিয়োনো মাছ, মাঠের টাটকা সবজি আর বাটা মশলার ঝাঁঝ— সেসব অনুভূতি উঠে আসে তাঁর রেসিপি থেকে। পুষ্পরানি সরকার বলেন,''আমি রাঁধতে ভালোবাসি,কিন্তু কোনও দিন ভাবিনি মানুষজন আমাকে চিনতে পারবেন এই রান্নার জন্য। অনেকে কলকাতা থেকে দেখা করতে আসে। অনেকে ফোন করে রেসিপি জানতে চায়। সবার ভাষা বুঝিও না। কিন্তু এই ভালোবাসাই আমার কাছে বড়ো প্রাপ্তি।''

এই বয়সেও পুষ্পরানি সরকারের রান্নার প্রতি এত টান দেখে অবাক হন নেটিজেনরা। বিশ্বজুড়ে তাঁর জনপ্রিয়তার নিরিখে ২০২০ সালে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'গোল্ডেন প্লে বাটনে' সম্মানিত করেছে। □

পুরাণকথা

বিশ্বামিত্রের তপোবল

বহু বছর আগে পৃথিবীতে একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি হয়। অনাবৃষ্টিতে খেতখামার, গাছপালা, বনজঙ্গল শুকিয়ে

মরুভূমি হবার উপক্রম হয়। চারদিকে একটু জলের অভাবে হাহাকার পড়ে যায়। জীবজন্তু কীটপতঙ্গ ছটফট করে মরতে থাকে।

সেই সময় ঋষি বিশ্বামিত্র শিষ্যদের নিয়ে গৌতমীগঙ্গার তীরে আশ্রমে বাস করছিলেন। একদিন এমন অবস্থা হলো যে আশ্রমের কোথাও খাওয়ার মতো কিছুই পাওয়া গেল না। সকলেই ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল। তখন বিশ্বামিত্র শিষ্যদের বললেন, তোমরা এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো এবং যেখানে যা পারো সংগ্রহ করে আনো। শিষ্যেরা গুরুর আদেশে তখনই খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু সারাদিন সন্ধান করেও খাওয়ার মতো কিছুই জোগাড় করতে পারল না। ফিরে আসার সময় রাস্তায় একটি মরা কুকুর দেখতে পেয়ে সেটিকেই উঠিয়ে নিয়ে গুরুর কাছে এল। বিশ্বামিত্র মরা কুকুরটিকে দেখে বললেন, তোমরা এর মাংস টকরো টুকরো করে কেটে ভালো করে পরিষ্কার করে রান্না করো। আমরা দেবতা, ঋষি , অতিথি, গুরু ও পিতৃপুরুষদের নিবেদন করে অবশিষ্ট মাংসে আমাদের ক্ষুধা মেটাবো।

বিশ্বামিত্রের কথামতো শিষ্যেরা কুকুরের মাংস রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল। অগ্নি ওই মাংস রান্নার সংবাদ গোপনে দেবরাজের কাছে জানিয়ে গেলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র দেবরাজ একটি বাজপাখির রূপ ধরে উড়ে গিয়ে মাংসের পাত্রটি উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় শিষ্যরা হকচকিয়ে গেল। তারপর সংবিৎ ফিরে পেতে তারা ঘটনাটি গুরুদেবের কাছে এসে নিবেদন করল।

শিষ্যদের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে বিশ্বামিত্র বিস্মিত হলেন। তারপর প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য ধ্যানমগ্ন হতেই ওই বাজপাখির স্বরূপ জানতে পারলেন। তখন তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন।

ইন্দ্র সে কথা জানতে পেরে ভীষণ ভয় পেয়ে মাংসের পাত্রটিকে মধুর পাত্রে পরিণত করে যেখান থেকে এনেছিলেন সেখানেই আগুনের ওপর রেখে দিলেন। বিশ্বামিত্র সেই মধুপূর্ণ পাত্র দেখে রাগে চিৎকার করে বললেন, ইন্দ্র, তোমার মধুর পাত্র নিয়ে গিয়ে মাংসের পাত্র ফিরিয়ে দিয়ে যাও, অন্যথায় আমি মহা অনর্থ ঘটাবো।

বিশ্বামিত্রের কথায় ইন্দ্র ভয় পেয়ে বললেন, আপনি মধু দিয়েই হোম করুন। দেবতা, ঋষি ও সবাইকে নিবেদন করে তাই পান করুন। কারণ কুকুরে মাংস তো আর যজ্ঞে প্রদান করা যায় না।

বিশ্বামিত্র বললেন, এই মধু পান করেই-বা কী লাভ হবে? সমগ্র পৃথিবী যখন এককণা খাদ্যের জন্য ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে, তখন আমাদের মধু পান করা মোটেই সঙ্গত মনে করছি না। সকলেই যদি অমৃত পান করতে পারে তবেই আমি ওই অমৃত গ্রহণ করতে পারি। অন্যথায় দেবতা ও পিতৃগণ ওই কুকুরের মাংসই গ্রহণ করবেন, এতে আমি কোনো পাপ দেখছি না।

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে ইন্দ্র পরম খুশি হয়ে বরুণদেবকে ডেকে পৃথিবীতে প্রচুর বর্ষণের আদেশ দিলেন। ফলে বৃষ্টিপাতে ধরণী শীতল হলো। সমগ্র প্রাণীকুলও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শ্যামাপদ সরকার

ভারতের বিপ্লবী

নেলী সেনগুপ্ত

বিপ্লবী নেলী সেনগুপ্তর নাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ভারত সরপকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। ইনি ভারতীয় ছিলেন না। ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ শহরের বাসিন্দা ছিলেন। পরে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের স্ত্রী হয়ে চট্টগ্রামে আসেন। স্বামীর মতো তিনিও পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি কারাবরণ করেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি দেশভাগের চরম বিরোধিতা করেছিলেন। দেশভাগের পর তিনি চট্টগ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন।

জানো কি?

- মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস।
- ১৮টি পর্বে বিভক্ত।
- শ্লোক সংখ্যা ১ লক্ষ।
- পঞ্চমবেদ বলা হয়।
- ৩টি স্তর– জয়, ভারত ও মহাভারত।
- ২টি সংস্করণ, উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়।
- বাঙ্গালি টীকাকার হলেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।
- প্রসিদ্ধ টীকা হলো ভারতভাবদীপ।
- প্রাচীন টীকা হলো ভারতার্থপ্রকাশ

ভালো কথা

সরস্বতীপুজোর আনন্দ

এবার আমাদের পাড়ার সরস্বতী পুজোতে দুর্গাপুজোর মতোই আনন্দ হয়েছে। পাড়ার ক্লাবে সবাই অঞ্জলি দিতে এসেছিল। আর দুপুরে সবাই খিচুড়ি প্রসাদ খেয়েছি। ছোটোদেরও আগের দিন থেকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দ হয়েছ সন্ধ্যেবেলায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধুনুচিনাচ, আবৃত্তি, অন্ত্যাক্ষরী, প্রদীপ জ্বালানো, শঙ্খ বাজানো প্রতিযোগিতা হয়েছে। সোনাইয়ের ঠাকুমা রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। পুরস্কার বিতরণ হয়েছে। মনে হচ্ছিল দুর্গাপুজোর মতো সরস্বতীপুজোতেও আনন্দ হয়।

প্রিয়ব্রত সাহা, নবম শ্রেণী, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ঠাকুমার গান

সোহনী পাল, একাদশ শ্রেণী, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর।

শীতের দিনেও খুব সকালে
ভাঙে ঠাকুমার ঘুম,
তারপরেতেই মন্ত্র বলার
পড়ে যায় যে ধুম।
গানের সুরে মন্ত্র পড়ায়
ভাঙে সবার ঘুম
ছোটোরাও জেগে ওঠে
পড়তে বসার ধুম।

বারোমাসই সমান তালে
মন্ত্র আউড়ে যায়
লেখাপড়া শেখেনি ঠাকুমা
তবু কেমন করে গায়!
ঠাকুমা বলে ছোট্টোবেলায়
মায়ের মুখে শুনে
বুড়ো বয়সে তাই আমার
সবই আছে মনে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

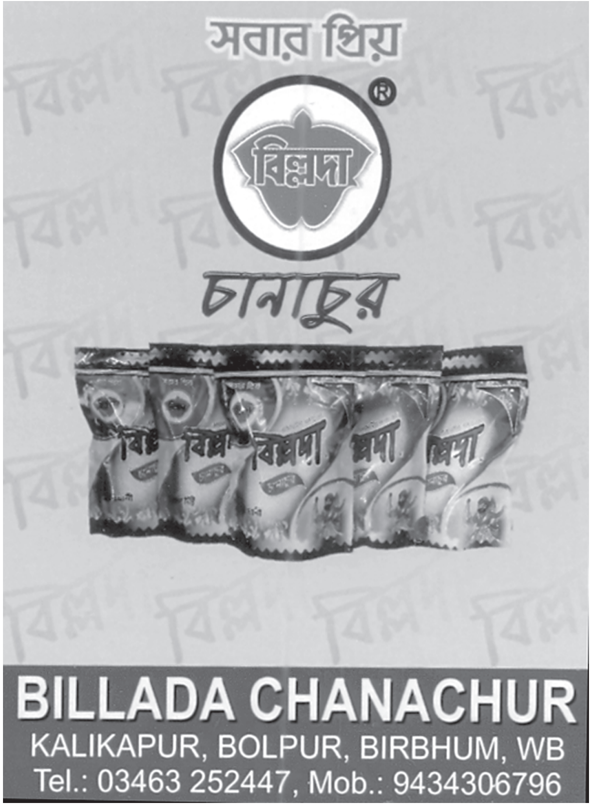

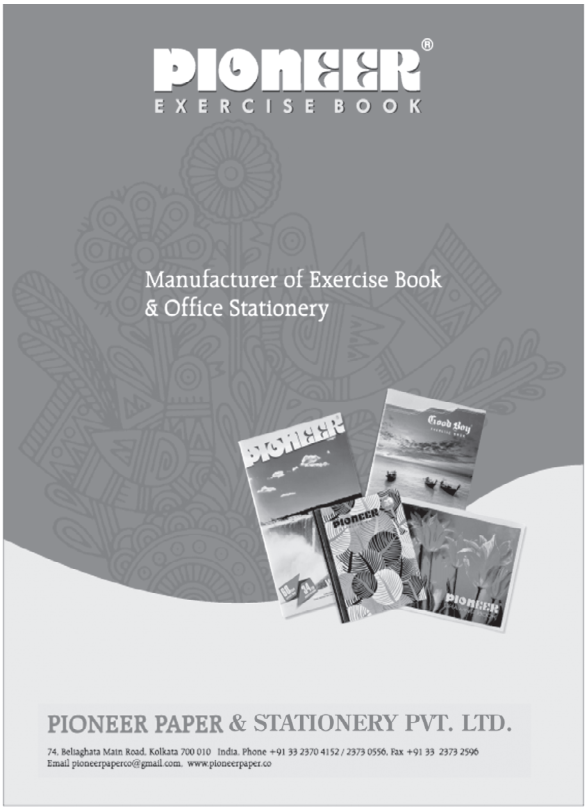

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

আলিগড়ে ইসলামি জেহাদি স্লোগান

গত ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠলো আল্লা হো আকবর, নারায়ে তকবির স্লোগান। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে বিজেপি নেতা ড. নিশীথ শর্মার পোস্ট করা ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গেছে, ওই বিশেষ দিনে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এনসিসি (ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস) ছাত্ররা ওই স্লোগান দুটি তুলছে।

এই সমস্ত ঘটনার সাক্ষী ছিলেন খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তারেখ মনসুর। কিন্তু সব দেখেশুনেও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন বলে অভিযোগ। অবশ্য এই ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসার পর নিমেষে তা ভাইরাল হয় এবং দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। চাপের মুখে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ওয়াসিম আলি জানিয়েছেন, ভিডিয়ো ফুটেজের ভিত্তিতে দোষী ছাত্রদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। দোষী প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে তাঁরা আলিগড় পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন বলে ওয়াসিম আলি জানিয়েছেন। অন্যদিকে সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় এই ধরনের জেহাদি স্লোগান দেওয়াকে জাতীয় পতাকার অবমাননা হিসেবে দাবি করে অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার দাবি তুলেছেন ড. নিশীথ শর্মা, তাঁর উল্লেখিত টুইটেই।

অনেকেই অবাক হচ্ছেন, উত্তরপ্রদেশের মতো যোগীরাজ্যে এমন দেশদ্রোহী ঘটনা ঘটানোর সাহস কী করে পায়? মনে রাখতে হবে, এই উত্তরপ্রদেশেই কিন্তু দারুল-উলুম-দেওবন্দের মতো ইসলামি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা চরম ইসলামি কট্টরবাদী ফতোয়ার জন্য সুপরিচিত। উত্তরপ্রদেশে প্রায় চার কোটি মুসলমান বাস করেন, যা সে-রাজ্যের মোট জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশ। সুতরাং এই বিপুল মুসলমান জনসংখ্যার মধ্যে থেকে মাঝেমধ্যেই দেশদ্রোহিতার সুর শোনা যায়।

এখানেই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠবে, মুসলমান জনসংখ্যা অধিক হলেই যে দেশদ্রোহিতার সুর শোনা যাবে, এমন কথা কোথায় বলা আছে? সেকুলারদের ভাষায় বলতে গেলে, এসব বলার অর্থ সাম্প্রদায়িকতার জিগির তোলা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হচ্ছে যে, নরেন্দ্র মোদী ভারতে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর থেকেই দেশদ্রোহিতার প্রবণতা চরম মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জেএনইউ-এ আফজল গুরুর জন্মদিন পালন দিয়ে ঘটনার শুরু, তারপর 'ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীকে অত্যাচারী সাজিয়ে, ভারতীয় সেনার ওপর জঙ্গি নাশকতাকে সমর্থন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশদ্রোহিতা প্রকাশ পেয়েছে। আর জাতীয়তাবাদীরা এসবের প্রতিবাদ করতে গেলেই শুনতে হয়েছে বাক্‌স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদির মতো গুরুতর অভিযোগ।

সাম্প্রতিক এই ঘটনার প্রবণতা খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে একটু আলাদা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ 'আল্লা হো আকবর' কিংবা 'নারায়ে তকবির'-এর মতো সাম্প্রদায়িক ইসলামি স্লোগান দেওয়া হলেও সরাসরি দেশবিরোধী কোনো কথা বলা হয়নি। স্রেফ এই অপযুক্তিতেই সেকুলারবাদীরা বলার সুযোগ পাবেন, ইসলামি স্লোগান তোলা এই সেকুলার দেশে মোটেই সংবিধান বিরোধী নয়!

> “নেহরুর সেকুলারিজমের ভূত যতদিন কিছু ভারতবাসীর ঘাড়ে চেপে থাকবে, ততদিন তারা ইসলামি কট্টরবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে দেশদ্রোহিতার নিখুঁত সম্পর্ক আছে দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকবে।”

বিরোধী নয়, এটা ঠিক। কিন্তু দেশভাগের সময় নোয়াখালি-সহ একাধিক জায়গায় এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক স্লোগান তুলে হিন্দুদের যেভাবে সন্ত্রস্ত করা হয়েছিল, আজ এতদিন পরেও তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। নেহরুর সেকুলারিজমের ভূত যতদিন কিছু ভারতবাসীর ঘাড়ে চেপে থাকবে, ততদিন তারা ইসলামি কট্টরবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে দেশদ্রোহিতার নিখুঁত সম্পর্ক আছে দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকবে। কলকাতাবাসীকে নতুন করে বোঝাতে হবে না যে, ক্রিকেটে পাকিস্তান জিতলে চিরকাল মুসলমানরা পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে তাদের জয় উদ্‌যাপন করে এসেছে। তাই এদেশের অধিকাংশ মুসলমান দেশভাগের পর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আজও মনেপ্রাণে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি; পাকিস্তানের সমর্থকই রয়ে গেছে। অধিকাংশ মুসলমানের এই প্রবণতা একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বিপদ তৈরি করেছে, অন্যদিকে দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যাও চরমে নিয়ে গিয়েছে। দেশভাগজনিত প্রস্তাবিত জনবিনিময় পশ্চিমবঙ্গে না হওয়ার দরুন এরাজ্য আজ অনুপ্রবেশ সমস্যা-কবলিত, বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে। সারা দেশের অবস্থাও যে বিশেষ ভালো নয়, আলিগড় চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিচ্ছে। এরপরেও হয়তো মুসলমান সম্প্রদায়িকতা ও দেশদ্রোহিতাকে সমানুপাতে না দেখার প্রচেষ্টা জারি থাকবে, এরপরেও হয়তো সেকুলারিজমের গুণগান করার অপচেষ্টা বজায় থাকবে। কিন্তু এর ফলে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতির মধ্যে যেটা হবে তা হলো দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যাহত হবে। □

ইকবাল দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেছিলেন

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

'সারে জাহাঁ সে অচ্ছা' খ্যাত, উদারপন্থীদের চোখের মণি মহম্মদ ইকবাল ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০ তারিখে সভাপতির ভাষণে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি :

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে বা বাইরে থেকে ভারতীয় ফেডারেলের মধ্যে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা নিয়ে বিস্তারিতভাবে কথা বলে যদি দেখা যায় দাবিগুলি পূরণ হলো না, তা হলে ভারতের মুসলমানদের একটি 'স্বাধীন ও সমন্বিত রাজনৈতিক পদক্ষেপের' জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

এইভাবে মুহম্মদ ইকবাল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত হন। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়রা তাঁকে তাঁর বিখ্যাত গান 'সারে জাহাঁ সে অচ্ছা'র রচয়িতা হিসেবে চেনে। নেহরুপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদীদের কাছে ইকবাল ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। এক ভারতীয় জওয়ানকে আমাদের জাতীয় সংগীত কী জিজ্ঞেস করাতে সে বলেছিল 'সারে জাহাঁ সে অচ্ছা'। একজন সোশ্যাল মিডিয়ায় জানতে চেয়েছে আমাদের জতীয় সংগীতে 'সারে জাহাঁ সে অচ্ছা' কথাটার কী মানে। কিন্তু সে সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকলেই বুঝতে পারা যায় যে ইকবাল ছিলেন 'গঙ্গা-যমুনা তেহজিবে'র মতো বিচিত্র ধারণার একজন অক্ষম প্রতিনিধি। উদারপন্থীরা ইকবালকে প্রশংসা করে অথচ ভারতবর্ষে চরম হিংস্রতা দেখা গেছে এই ব্যক্তির কারণেই।

আধুনিক ভারতে তাঁর উত্তরাধিকার মূলত

এই দুটি লাইনের মধ্যেই রয়েছে বলে মনে করা হয় এবং অনেকাংশে তাঁর ভয়ংকর দিকটা উপেক্ষা করা হয়। এটা বোঝা কঠিন নয় কেন ১৯১০ সালে তিনি যে তারানা-ই-মিলি রচনা করেছিলেন তার কোনো উল্লেখ করা হয় না ইচ্ছে করে। তারানা-ই-মিলিতে ইকবালের ইসলামি প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে 'সারে জাহাঁ সে অচ্ছা'র মতো একই ছন্দ ও তাল রয়েছে। শিশুদের জন্য রচিত প্রথম স্তবকটি ষষ্ঠটির বিপরীত, সেখানে বলা হয়েছে, 'সিন ও-আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা, মুসলিম হ্যাঁয় হাম, ওয়াতহান হ্যায় সারা জাহাঁ হামারা'—

'আরব আমাদের, ভারত আমাদের, আমরা মুসলমান, সারা পৃথিবী আমাদের দেশ'।

কবিতায় ইসলামি উন্মাহর এই মনোভাব, এমন এক উন্মাহ যারা নিজেদের কোনো জাতীয় সীমারেখায় আবদ্ধ করে না বরং বিশ্বাস করে যে বিশ্ব শাসন করার আল্লা প্রদত্ত অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। উন্মাহ প্রেমীদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইকবাল বহু বছর ধরে এই ধারণা নিয়েই বড়ো হয়েছিলেন, কিন্তু ১৯০৪- ১৯১০ সালে তিনি ব্রিটেন ছাড়ার সময় এটা প্রকট হয়েছিল। এই সময়ে তিনি ইসলামিক কট্টরবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে ঝুঁকেছিলেন। জীবনের শেষ দিকে ইকবালকে পাকিস্তানের একজন অক্লান্ত প্রবক্তা হিসেবে দেখা যায়।

১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের ২৫তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ইকবাল বলেন, ইসলামের আইন ও নীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সাহিত্য মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে তিনি 'বিশ্ব বাস্তবতা' হিসেবে এর তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কথা বলার সময় ইকবাল লুথার কীভাবে খ্রিস্টধর্মের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং ইসলামে অনুরূপ বিদ্রোহ অসম্ভব ছিল তা নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে যদিও ইউরোপীয় মূল্যবোধ তৎকালীন তরুণ মুসলমানদের মনে ঢুকেছিল, তবু খ্রিস্টান ধর্মে যা ঘটছে তা ইসলামে সম্ভব ছিল না। তিনি আরও বলেছেন, ইউরোপের বিপরীতে, যেখানে আত্মা ও পদার্থের দ্বৈততা অকল্পনীয়ভাবে গৃহীত হয়েছিল, ইসলামে ঈশ্বর ও মহাবিশ্ব, আত্মা ও পদার্থ, চার্চ ও রাষ্ট্র একে অপরের জন্য জৈব সহচর। এক কথায় ইকবাল ইসলামকে খ্রিস্টধর্মের চেয়ে ভালো ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

অভিন্ন ভারতীয় জাতির ঐক্যের কথা বলার সময় ইকবাল মুসলমানদের জন্য ইসলামীয় ধারণা ও নীতির উপর ভিত্তি করে 'মাতৃভূমি' ধারণা প্রচার শুরু করেন। তিনি ভারতে মুসলমানদের সংখ্যালঘু হওয়ায় ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার নীতি খুঁজে বের করা কেন সম্ভব হয়নি তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। যোগ করেছিলেন যে বর্ণ ও ধর্মে বিভক্ত প্রতিটি গোষ্ঠীর 'ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ' ছিল। আসলে কোরান পড়া মুসলমানের আবেগকে এইভাবে তিনি

বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর কোরান সম্পর্কে যাঁরা অজ্ঞ তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা তিনি নতুন করে উসকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করার জন্য 'জনগণের সহজাত অক্ষমতা'র কারণে প্রাচীন ভূমি (ভারত) ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কারণ, তাঁর মতে, লোকেরা একে অপরকে সন্দেহ করে এবং 'অভ্যন্তরীণভাবে একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা' করে।

'সম্ভবত আমরা স্বীকার করতে রাজি নই যে প্রতিটি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী অবাধ উন্নয়নের অধিকার রয়েছে। ...আমি যতদূর মুসলিম মন পড়তে পেরেছি, আমার ঘোষণা করতে কোনো দ্বিধা নেই যে ভারতীয় মুসলমান তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আদলে তার ভারতীয় জন্মভূমিতে পূর্ণ ও অবাধ বিকাশের অধিকারী। একটি স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্তের ভিত্তিতে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য তার সমস্ত কিছু দিতে প্রস্তুত থাকবেন'। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায় শরিয়ত ভিত্তিক শাসন কায়েম করতে হবে ভারতের একটা উল্লেখযোগ্য অংশে। তাঁর বক্তৃতায় এইভাবে তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেছেন।

নেহরু রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'এমনকী নেহরু রিপোর্ট সাম্প্রদায়িকতার এই উচ্চতর দিকটার মূল্য স্বীকার করে। 'জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যে কোনো পৃথক জাতিই থাকা উচিত নয়। কিন্তু কট্টর আন্তর্জাতিকতাবাদীরাও স্বীকার করেন যে পূর্ণতম জাতীয় স্বায়ত্তশাসন ছাড়া একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গঠন করা কঠিন। তাই সম্পূর্ণ 'সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন' ছাড়া এবং 'সাম্প্রদায়িকতা' যা ভালো অর্থে সংস্কৃতি বোঝায়, সেটি ছাড়া একটি সুসংহত জাতি গঠন করা কঠিন হবে।'

প্রাথমিক ভাবে ইকবাল তার বক্তৃতার সময় ভারতের মধ্যে একটি 'পৃথক মুসলমান স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য' থাকার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই বিষয়টিকেই ইকবালের প্রতি সহানুভূতিশীল বেশিরভাগ লোক বলেন যে তিনি একটি পৃথক দেশের পক্ষে নন বরং ভারতে মুসলমানদের জন্য সমান সুযোগের পক্ষে ছিলেন।

কিন্তু ইকবাল বলেছিলেন যে ভারতকে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করার সময় লোকেরা বিবেচনা করে না যে ভারতে বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও ধর্ম রয়েছে এবং একটি সাধারণ জাতি চেতনা তাদের আচরণ নির্ধারণ করে না। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার না করে ভারতে ইউরোপীয় গণতন্ত্র প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে ভারতের মধ্যে একটি মুসলমান ভারত তৈরির জন্য মুসলমানদের দাবি ছিল সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

তিনি বলেছিলেন যে পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে বা তার বাইরে একটা একক স্বশাসিত দেশ দেখতে চান। তিনি বলেছিলেন, 'একটি একত্রিত উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান দেশ গঠন আমার কাছে অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের চূড়ান্ত নিয়তি বলে মনে হচ্ছে'। তিনি আরও বলেন, 'প্রস্তাবটি নেহরু কমিটির সামনে রাখা হয়েছিল। তারা এটা প্রত্যাখ্যান করেছিল যে, যদি কার্যকর করা হয়, তাহলে এটি একটি অত্যন্ত অদম্য দেশ দেবে। এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে এটি সত্য।'

ভারতকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান দেশ বলে অভিহিত করে ইকবাল দাবি করেছিলেন যে একটি পৃথক মুসলমান জাতির ধারণা হিন্দু বা ব্রিটিশদের জন্য ভয়ের কারণ নয়। মুসলমানদের অবাধ উন্নয়নের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তাবাদী হিন্দু রাজনীতিবিদদের প্রস্তাবিত একক সরকারের অধীনে অসম্ভব।

হিন্দুদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা চলে যাবে সে বিষয়ে ইকবাল বিস্তর বলেছেন। তিনি ব্রিটিশ ভারত বা সামগ্রিকভাবে ফেডারেল ভারতে স্বাধীন রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর মতে, ব্রিটিশ ভারতের পার্লামেন্টে ৩৩ শতাংশ শেয়ারের দাবি এবং ফেডারেল ইন্ডিয়ার পার্লামেন্টের ক্ষেত্রেও সেই একই দাবি করা সঠিক ছিল যাতে সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার সামান বণ্টন হয় অর্থাৎ ১২ শতাংশ মুসলমানের জন্য তিনি ৩৩ শতাংশ আসন দাবি করেছিলেন।

তিনি বলেন, 'যদি এই দাবিগুলো মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে মুসলমানদের সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত বড়ো ও সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন উঠবে। তারপর ভারতের মুসলমানদের স্বাধীন ও সমন্বিত রাজনৈতিক পদক্ষেপের মুহূর্ত আসবে। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য তিনি বললেন, 'আপনি যদি আপনার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে একেবারেই আন্তরিক হন তবে আপনাকে অবশ্যই এই জাতীয় পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

এখানেই ইকবাল মুসলমানদের একত্রিত হওয়া এবং একক শক্তি হিসেবে কাজ করার কথা বলেছেন। তিনি মুসলমানদের 'গোষ্ঠী' চেতনা থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি এশিয়া জুড়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ভারতের ৭ কোটি মুসলমানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে 'আমাদের অসংগঠিত অবস্থা ইতিমধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে গুলিয়ে দিয়েছে। ...আমি...এই অনুভূতি লুকিয়ে রাখতে পারি না যে অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান সংকট মোকাবিলায় আমাদের সম্প্রদায়কে একটি স্বাধীন লাইন অব অ্যাকশন গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হতে পারে। এই জাতীয় সংকটে রাজনৈতিক কর্মের এক স্বাধীন লাইন শুধুমাত্র একটি একক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত একটি দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব'। এই লাইন অব অ্যাকশনই পরে ডাইরেক্ট অ্যাকশনে পরিণত হয়। □

শোক সংবাদ

মালদহ নগরের সিঙ্গাতলা প্রভাত শাখায় স্বয়ংসেবক তথা উত্তরবঙ্গ প্রান্ত ধর্মজাগরণ সংযোজক কৃষ্ণ কুমার দাসের মাতৃদেবী শ্রীমতী দাস গত ১০ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি- নাতনিদের রেখে গেছেন।

ত্রিপুরার বিধানসভা ভোটের হালচাল

সর্বানন্দ মণ্ডল

আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভার ত্রয়োদশ নির্বাচন। বিধানসভার আসন সংখ্যা মোট ৬০। অন্য রাজ্যে কয়েক দফায় ভোট হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে এক দফায় ভোট গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশন। ২০১৮ সালের ভোটে জনগণ বিজেপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসান। সেই বছর বিজেপির সঙ্গে আইপিএফটি (ইনডেজিনিয়াস পিপলস্ ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা)-এর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ভোটে লড়েছিল। ৬০টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই পেয়েছিল ৩৬টি আসন আর আইপিএফটি পায় ৭টি আসন। ফলে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট মন্ত্রীসভা গঠন করে। বিজেপি থেকে নির্বাচিত হন মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা। তবে শরিক দলের ৪ জনকে মন্ত্রীপদ দেওয়া হয়।

এবার বিধানসভা ভোটে ৩১০ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়। পরীক্ষানিরীক্ষার সময় মোট ১৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়ে যান ২৯১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ৩২ জন তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ায় চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন ২৫৯ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির ৫৫ জন, তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ জন, সিপিআই(এম)- এর ৪৩ জন সিপিআই-এর ১ জন, জাতীয় কংগ্রেসের ১৩ জন, ইনডেজিনিয়াস পিপলস্ ফ্রন্ট অব ত্রিপুরার ৫ জন, তিপ্রা মথা পার্টির ৪২ জন, সিপিআই (এম, এল)-এর ১ জন, এআইএফবি-র ১ জন, টিপিপি-র ২ জন, টিএমসি'র ১ জন, আরএসপি-র ১ জন, অন্যান্য স্বীকৃতিহীন দলের ৭ জন প্রার্থী রয়েছেন। এছাড়া নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা ৫৮ জন। ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার সারারাজ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৯টি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগে রাজ্যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৩৩২৮টি, এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৩৩৭টি।

নির্বাচনে ২৫ বছর শাসন করা সিপিএম তার চিরশত্রু কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জোট করে। উদ্দেশ্য বিজেপি সরকারকে হঠানো। ২ ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর দেখা গেল গোটা রাজ্যেই তথাকথিত বাম-কংগ্রেস জোটের হ য ব র ল অবস্থা। মানুষ বলাবলি করছে এটা জোট না ঘোঁট, এ নিয়েই সর্বত্র জল্পনা শুরু হয়েছে। আসন সমঝোতা যদি হয়ে থাকে, তাহলে সমঝোতার এই নমুনা! যা দেখে গোটা রাজ্যে মানুষের হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে সিপিএম এবং কংগ্রেস দুই দলই। বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতায় প্রথমে ১৩টি আসন কংগ্রেসকে দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থী ঘোষণা করে ১৭টি আসনে। এনিয়ে ক'দিন ধরে চাপান-উতোর চলে। কদিন আগে দেখা গেল কংগ্রেসকে দেওয়া আসনে সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে। যেমন আগরতলা, চড়িলাম, টাউন বড়োদোয়ালী, বনমালীপুর, তেলিয়ামুড়া, ধর্মনগর এইসব কেন্দ্রেই সিপিএম প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিজেপিকে হঠাতে তথাকথিত জোট বা আসন সমঝোতার কী প্রয়োজন ছিল? কী প্রয়োজন ছিল জোটের নামে ঘোঁট তৈরি করার? কী প্রয়োজন ছিল মানুষের সামনে হাসির খোরাক হয়ে ওঠার? ভোটের আগেই তথাকথিত জোটের যে ছবি রাজ্যবাসী দেখলেন, ভোটের পর কী হবে, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ত্রিপুরার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ তা ভালো করেই জানেন। ভোটের আগে সব মিলিয়ে এইসব ইঙ্গিত মোটেই সুখকর নয়।

এবার মনোনয়ন পর্বের দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়েছে। এক, গোটা মনোনয়নপর্ব ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। রাজ্যের কোনও মহকুমা থেকে, এমনকী কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একটিও অভিযোগ আসেনি। মনোনয়নকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কোথাও অশান্তি, উত্তেজনার খবর পাওয়া যায়নি। কোথাও মনোনয়ন জমা দিতে কোনও অসুবিধা হয়েছে, অথবা কোনও প্রার্থী অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীসমর্থকদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে— এমন একটাও অভিযোগ শোনা যায়নি।

২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি জল, বিদ্যুৎ চাকুরি, জ্বালানি গ্যাস, সামাজিক ভাতা সাতশো টাকা থেকে বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা পরিচালিকা ভাতা দিচ্ছেন। কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, হেল্পার, হোমগার্ড, চা-বাগানের শ্রমিকের মজুরি বাড়ানো হয়েছে অনেক টাকা। ২০২২-এর ডিসেম্বরে কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া হয়েছে ১২ শতাংশ যা নজিরবিহীন। তাই বলা যায়, এবারের ভোটে বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসবে।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)

বাংলাদেশে মন্দির ভাঙচুর ঘিরে উত্তেজনা, নিষ্ক্রিয় পুলিশ

শিতাংশু গুহ ॥ গত ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের সিঁদুরপিণ্ডি থেকে আটোয়ারি পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সমস্ত মন্দিরে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় সূত্রের খবর সবমিলিয়ে ১৪ টি মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙা হয়েছে। এলাকার মানুষ পুলিশে অভিযোগ করলেও কোনও সুরাহা হয়নি। অভিযুক্তরা এখনও অধরা।

৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার দৈনিক 'ভোরের কাগজ' একটি প্রতিবেদনে জানায় যে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের ১৪টি মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙা হয়েছে। ৪ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে ধনতলা, চাড়োল ও পাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এই ঘটনা ঘটায় দুষ্কৃতীরা। এরমধ্যে ধনতলায় ৯টি, চাড়োলে ১টি, পাড়িয়ায় ৪টি মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর হয়। ধনতলার সিঁদুরপিণ্ডি থেকে থেকে টাকাহারা পর্যন্ত ১টি হরিবাসর মন্দির, ১টি কৃষ্ণ ঠাকুর মন্দির, ১টি লক্ষ্মী, ৫টি মনসা মন্দির ও একটি কালী মন্দিরে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। স্থানীয় এক হিন্দু নেতা জানান চাড়োল ইউনিয়নে একটি কালী মন্দির, পাড়িয়ায় একটি বুড়ি-বুড়া মন্দির, ১টি লক্ষ্মী মন্দির, ১টি আমাতি মন্দির ও ১টি মাসান মাঠ মন্দিরে প্রতিমা ভাঙা হয়েছে। শুধু ভাঙা নয়, প্রতিমার হাত-পা, মাথা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে, কিছু প্রতিমা ভেঙে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশে মন্দির ও মন্দিরের প্রতিমা ভাঙাটা জলভাত। পুলিশ রুটিনমাফিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অভিযোগ নেয়। কিন্তু একজনও অভিযুক্ত ধরা পড়ে না। স্থানীয় মানুষ বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক উদাসীনতার দিকেই আঙুল তুলেছেন। স্থানীয় হিন্দু সংগঠনগুলি আগামীদিনে জোটবদ্ধভাবে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তারাপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরে সহস্রাধিক মানুষের গীতাপাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৮ জানুয়ারির ভোরে তারাপীঠে তারা মায়ের মন্দিরে সংস্কৃত পরিষদের রাজ্য সম্পাদক মানস ভট্টাচার্য-সহ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহারাজগণ পূজা, আরতির মাধ্যমে শোভাযাত্রা সহকারে তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তারাপুর সরস্বতী শিশুমন্দির সংলগ্ন মাঠে পৌঁছান। সেখানে উপস্থিত কর্মকর্তারা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন। শোভাযাত্রা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন গ্রামীণ সবুজ রশ্মি পত্রিকার সম্পাদক, তারা মায়ের মন্দিরের প্রধান পাণ্ডাদের অন্যতম পুলক চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী, পাণ্ডা এবং সাধারণ মানুষজন। সরস্বতী শিশু মন্দিরে হাজির হওয়া ২ হাজারেরও বেশি গীতাপ্রেমীকে উত্তরীয়-সহ বরণ করে গীতা পাঠ ও নির্ধারিত যজ্ঞমঞ্চে বসানো হয়। দুপুর ১১ টায় উপস্থিত সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের কণ্ঠে সমবেত গীতাপাঠ ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহারাজগণ যজ্ঞ মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে যজ্ঞ কাঠে অগ্নি সংযোগ করে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন। দুপুর ১টা পর্যন্ত পর্যন্ত সমবেত গীতাপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠান চলে। তারপর অখিল বঙ্গ সংস্কৃত পরিষদের রাজ্য সম্পাদক মানস ভট্টাচার্য জানান, "আগামী ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে কলকাতায় গীতাপাঠ কর্মসূচি পালন করা হবে।" বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ তাঁর বক্তব্যে সনাতন ধর্মের উজ্জ্বল দিকগুলি তুলে ধরেন এবং বর্তমানে সনাতন ধর্মের উপর যে আঘাত আসছে বা অপমানজনক কুরুচিকর মন্তব্য করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে সনাতনধর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

বাজেটে মহিলা সম্মান সঞ্চয়পত্র চালুর প্রস্তাব

পিআইবি॥ দেশের আর্থিক ক্ষেত্রকে আরও সুসংহত করতে ২০২৩-২৪ কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তার মধ্যে একটি হলো 'মহিলা সম্মান সঞ্চয়পত্র' চালু করার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবকে এবারের বাজেটে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। গত ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করার সময় তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা অমৃতকালে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে প্রযুক্তিচালিত তথা জ্ঞানভিত্তিক এক অর্থনীতি যা গড়ে উঠবে সরকারি ব্যাপক লগ্নি প্রচেষ্টার হাত ধরে।' সেই লক্ষ্যেই এবারের বাজেটে নারী ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার অমৃতকালে নারী ক্ষমতায়নের মতো বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই মহিলা সম্মান সঞ্চয়পত্র চালু করার প্রস্তাব আনা হয়েছে ২০২৩-২৪ কেন্দ্রীয় বাজেটে। ২০২৫-এর মার্চ পর্যন্ত এই

সঞ্চয় প্রকল্পটি চালু থাকবে। এর আওতায় দু'বছর মেয়াদকালের জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৭.৫ শতাংশ হারে সুদ-সহ আমানতের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে মহিলা ও কন্যা সন্তানের নামে। প্রয়োজনে আমানতের কিছু অংশ তুলে নেওয়ারও সুযোগ থাকবে এই সঞ্চয় প্রকল্পটিতে।

এবারের বাজেট প্রস্তাবে প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষমতায়নের দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমের আওতায় আমানতের সর্বোচ্চ মাত্রা ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

অন্যদিকে মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট স্কিমে সাড়ে চার লক্ষ টাকার পরিবর্তে এখন থেকে সিঙ্গল অ্যাকাউন্টে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা যাবে। আবার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে আমানতের সর্বোচ্চ মাত্রাকে ৯ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

ভোডাফোন-আইডিয়ার শেয়ার নিচ্ছে কেন্দ্র

বিশেষ সংবাদদাতা॥ ভোডাফোন-আইডিয়া'র সবথেকে বড়ো অংশীদার হতে চলেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, ভিআই-এর স্পেক্ট্রাম ও অন্যান্য খাতে ঋণ বাবদ প্রচুর টাকা বকেয়া পড়েছে। সেই বকেয়া মেটাতে গিয়ে নাজেহাল ভোডাফোন-আইডিয়া কর্তৃপক্ষ তাদের একটি বড়ো অংশের শেয়ারের অংশীদার হওয়ার অনুরোধ করেছে কেন্দ্রকে। বকেয়া খাতে সুদ বাবদ পাওনা অর্থের বদলে সেই শেয়ার অধিগ্রহণে রাজি হয়েছে কেন্দ্র। গত ৩ জানুয়ারি ভোডাফোন-আইডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে যে সরকারের প্রাপ্য সুদ বাবদ পাওনা অর্থ শেয়ারে রূপান্তর করার জন্য সরকারের তরফে তাদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মোট ১৬,১৩০ কোটি টাকার কিছু বেশি সরকারি পাওনা ইকুইটি শেয়ারে ট্রান্সফার করা হবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এরফলে বিপুলআর্থিক দায়ভারে জর্জরিত ভোডাফোন- আইডিয়ার ব্যবসায়িক অস্তিত্ব নিয়ে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল তা আপাতত কেটে গেল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যে ভিআই-এর শেয়ার অধিগ্রহণ করা শুরু হয়ে গেছে বলে খবর। ভোডাফোন-আইডিয়াকে ১০ টাকা দামের ১৬১৩ কোটি শেয়ার ইস্যু করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এবার থেকে ভোডাফোন-আইডিয়ার ৩৫ শতাংশ শেয়ার থাকবে সরকারি হাতে। ২০১৮ সালে গাঁটছড়া বাঁধে দুই টেলিকম সংস্থা ভোডাফোন ও আইডিয়া। নাম হয় ভিআই। কিন্তু যাত্রা শুরুর প্রথম থেকেই আশানুরূপ লাভের মুখ দেখেনি সংস্থাটি। বাড়তে থাকে ঋণের বোঝা। ইন্ডাস টাওয়ার্সের কাছে ভিআই-এর ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকা। এই অবস্থায় টেলিকম পরিষেবার ক্ষেত্রে ভিআইকে তাদের টাওয়ার ব্যবহার করতে দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয় ইন্ডাস টাওয়ার। ভিআই পরিষেবা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন গ্রাহকরা। তবে ৩৫ শতাংশ শেয়ার কেন্দ্র নেওয়ায় স্বস্তি পাচ্ছেন ভিআই কর্তা ও গ্রাহকরা।

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫

E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৩১ ।।

অকস্মাৎ রাতে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অমিয় করুণাধারা বর্ষিত হলো মহানামব্রতজীর উপর।

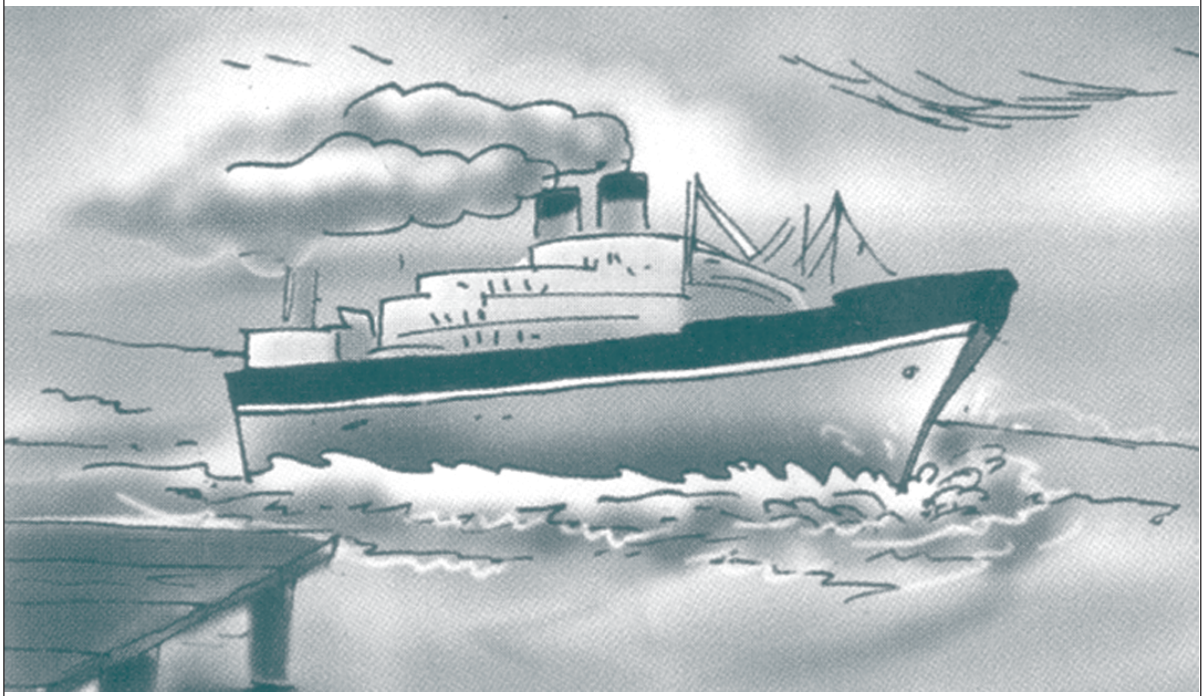

পরদিন সকালে ম্যানেজার তাঁকে আমেরিকা যাবার অনুমতি দিলেন। লি হ্যাভার বন্দর থেকে তাঁর জাহাজ ছাড়ল।

(ক্রমশ)